দেবতা অনুরাগী রবীন্দ্রনাথ

প্রণবেশ চক্রবর্তী

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ
১লা বৈশাখ ১৩৫৯

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা-২৯

মুদ্রাকর
আর. রায়
সুব্রত প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৫১ ঝামাপুকুর লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
গৌতম রায়

অকালে লোকান্তরিত আমার বাবা
অমূল্যচন্দ্র চক্রবর্তী
এবং আমার মা
কল্যাণী দেবীকে

ভূমিকা

সবকিছুকেই ইচ্ছেমত চোখ ঘুরিয়ে দেখা যায়, দেখা যায় প্রয়োজন মত পূর্ণরূপ বা খণ্ডরূপ। সেটা যে দেখবে, তার ইচ্ছাধীন। রবীন্দ্রনাথকে দেখার ব্যাপারেও এরকম খণ্ডিত প্রয়াস বারবার পরিলক্ষিত। তিনি ঐশ্বর্যময়। তাঁর বিপুল ঐশ্বর্যকে দু'চোখ ভরে দেখতে হলে চোখেরও শক্তি থাকা দরকার। আমাদের সে শক্তি কতটা? তিনি দেবতায় বিশ্বাস করেন না, দেব-দেবীর প্রতি নেই তাঁর অনুরাগ—এমন বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় যাঁরা প্রাণপণে তন্ময়, তাঁরাও সেই খণ্ডিত দর্শনে পূর্ণতৃপ্তির আনন্দে বিভোর।

অনেকদিন ধরেই এ ব্যাপারে আমার মনে কিছু প্রশ্ন দেখা দেয়। সে সময় পম্পা মজুমদারের লেখা "রবীন্দ্র সংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস" বইখানি হাতে আসে। সেই বইয়ের সূত্র ধরে অন্য বইয়ের সন্ধান। একজে ধরে বহুকে পেতে চাই। পাইও একে একে। সে সময়েই রবীন্দ্রচর্চায় খ্যাতিমান আমার অগ্রজ সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরীর সঙ্গে এ প্রসঙ্গে বারবার আলোচনার সুযোগ পাই। তিনিও বলে দেন নতুন নতুন পথের সন্ধান।

অবশেষে সব মিলিয়ে কয়েকটি প্রসঙ্গ তুলে ধরি যুগান্তর, দৈনিক বসুমতী, উদ্বোধন এবং প্রণব পত্রিকায়। তারপর সব প্রসঙ্গকে একসূত্রে গেঁথে "দেবতা অনুরাগী রবীন্দ্রনাথের" এই রূপ। এটাও কি পূর্ণরূপ? নিজেরই মনে রয়েছে সংশয়। আরও কাজ রইল বাকি। সনাতন ভারতবর্ষকে দেখার চোখ খুলে দিয়েছিলেন আমার মামা আচার্য করুণাময় সরস্বতী—যিনি জীবন্ত বিশ্বকোষ নামে এ সংসারে পরিচিত। আর আমার এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রবীন্দ্রচর্চা প্রকাশের সুযোগই পেতাম না, যদি না সমীর নাথ ব্যক্তিগতভাবে আমার মত একজন অক্ষম লেখকের দিকে হাত বাড়িয়ে দিতেন।

প্রণবেশ চক্রবর্তী

সূচীপত্র

দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ এবং ব্রাহ্মধর্ম

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার চার পুরুষের ঐতিহ্য নিয়ে এক অনন্যসাধারণ বংশধারার প্রতীক। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা শিল্পাচার্য অবনীন্দ্র-নাথ ঠাকুরই নন, এই পরিবার এ দেশকে আরও অনেক প্রতিভাবান পুরুষ দিয়ে গৌরবান্বিত করেছেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সময় থেকেই ঠাকুর-পরিবার ব্রাহ্মধর্মের পৃষ্ঠপোষক—পরবর্তীকালে আদি ব্রাহ্মসমাজের মূল দুর্গ--যার ধারক ও বাহক হন রবীন্দ্রনাথ। হিন্দুধর্মের সীমার মধ্যেই আরেকটা নতুন ধর্মমত (যা কিনা অপৌত্তলিক, অবতারবাদে অবিশ্বাসী এবং গুরুবাদে আস্থাহীন) অনুসরণ করার মূল প্রেরণা ঠাকুর-পরিবারে কি ভাবে এসেছিল, কেন হিন্দু-সমাজের বাইরে গিয়ে একান্ত বাধ্য হয়েই সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, কেন বচনে ও ভাষণে সংস্কারমুক্তির সংকল্প নিয়েও বাস্তবে সংস্কারমুক্ত হতে পারেন নি তাঁরা, সেটা সঠিক ভাবে বুঝতে হলে ঠাকুর-পরিবারের নেপথ্য-কাহিনী অনুসরণের যথার্থ প্রয়োজন রয়েছে।

জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর-পরিবারের সূচনা করেন নীলমণি ঠাকুর—যিনি আদিতে ছিলেন কুশারী। সূচনাকাল হচ্ছে ১৭৮৪ সালের জুন মাস। আর এই নীলমণি ঠাকুরের আদি পুরুষ হচ্ছেন জগন্নাথ কুশারী। যতদূর তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, জগন্নাথ কুশারীর পূর্বপুরুষ দীন কুশারী তৎকালীন বঙ্গদেশের অধিপতি মহারাজ ক্ষিতি শূরের কাছ থেকে বর্ধমান জেলার 'কুশ' নামে একটি গ্রাম পান। সেই 'কুশ' গ্রামের নাম অনুসারেই কুশারী পদবীর জন্ম—এমন কথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

দীন কুশারীর পিতা ছিলেন ভট্টনারায়ণ। আর এই দীন কুশারীর

অষ্টম কি দশম পুরুষ পরে আসেন জগন্নাথ। অবশ্য এ সম্পর্কে এখনও কিছু কিছু বিতর্কের অবকাশ বর্তমান। জগন্নাথের পুত্র পুরুষোত্তম এবং পুরুষোত্তমের প্রপৌত্র রামানন্দ। আর এই রামানন্দের দুই পুত্র মহেশ্বর ও শুকদেব এবং তাঁদের সময় থেকেই কুশারী পরিবার কলকাতার বাসিন্দা এবং ঠাকুর-পরিবারের উৎস-ক্ষেত্র নির্ণীত।

আদিতে যাঁরা কুশারী, অন্তে তাঁরাই ঠাকুর—এটা কি ভাবে হল? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে (প্রথম খণ্ড : পৃঃ ৩) অনুসরণ করতে পারি। তিনি বলেছেন : কথিত আছে, জ্ঞাতি-কলহে বিরক্ত হইয়া মহেশ্বর ও শুকদেব নিজ গ্রাম বারোপাড়া হইতে কলিকাতা গ্রামের দক্ষিণে গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করেন। সে-সময় কলিকাতা ও সুতানটিতে শেঠ বসাকরা বিখ্যাত বণিক। এই সময়ে ইংরেজদের বাণিজ্যতরণী গোবিন্দপুরের গঙ্গায় আসিয়া দাঁড়াইত। পঞ্চানন কুশারী ইংরেজ 'কাপ্তেন'দের এই সব জাহাজে মালপত্র উঠানো নামানো ও খাদ্যপানীয় সংগ্রহাদি কর্মে প্রবৃত্ত হন। এই সকল শ্রমসাধ্য কর্মে স্থানীয় হিন্দু-সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তাঁহার সহায় ছিল। সেই সকল লোকে ভদ্রলোক ব্রাহ্মণকে তো নাম ধরিয়া ডাকিতে পারেন না, তাই তাহারা পঞ্চাননকে "ঠাকুর মশায়" বলিয়া সম্বোধন করিত। ফলে জাহাজের কাপ্তেনদের কাছে ইনি পঞ্চানন 'ঠাকুর' নামেই চলিত হইলেন, তাহাদের কাগজপত্রে Tagore, Tagure লিখিতে আরম্ভ করিল। এইভাবে 'কুশারী' পদবীর পরিবর্তে 'ঠাকুর' পদবী প্রচলিত হইল।

পঞ্চাননের দুই পুত্র—জয়রাম ও রামসন্তোষ, আর শুকদেবের এক পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র। এই তিন পুত্রই কিছু কিছু ইংরেজী শিখে কোম্পানীর সেবা করে রীতিমত অর্থবান ব্যক্তিতে পরিণত হন। জয়রামের তিন পুত্র - নীলমণি, দর্পনারায়ণ এবং গোবিন্দরাম। জয়রাম তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আনন্দীরামকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। জয়রামের পুত্ররাই পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে জমি ক্রয় করে বাসগৃহ নির্মাণ করেন।

তাঁদের গৃহদেবতা ছিলেন শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জীউ। এই দেবতার নামে সঞ্চিত অর্থে কোম্পানির কাগজ কিনে 'দেবত্র' করে দিয়েছিলেন। নীলমণি ও দর্পনারায়ণ সাহেবদের 'দেওয়ানী' করে কিছু অর্থ পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু সামাজিক সম্মান পান নি। সেই জন্য তাঁরা ব্যবসার টাকায় জমিদারি কিনে জমিদার সেজে সমাজে অভিজাত হয়েছিলেন। পরবর্তী কালে পারিবারিক বিরোধের ফলে নীলমণি এক লক্ষ টাকা নিয়ে পাথুরিয়াঘাটার বাড়িঘর দর্পনারায়ণকে ছেড়ে দেন এবং নিজে গিয়ে জোড়াসাঁকোয় বসতি স্থাপন করেন।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের সূচনা করেন নীলমণি ঠাকুর। নীলমণির তিন পুত্র—রামলোচন, রামমণি এবং রামবল্লভ এবং এক কন্যা—কমলমণি। রামলোচনের কোন পুত্র ছিল না বলে তিনি ভ্রাতা রামমণির পুত্র দ্বারকানাথকে দত্তক গ্রহণ করেন। রামলোচন ছিলেন সে যুগের সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত ব্যক্তি। ১৮০৭ সালে রামলোচনের মৃত্যু হয়, তখন দ্বারকানাথের বয়স বারো-তেরো বছর। এই দ্বারকানাথই স্বীয় যোগ্যতাবলে ব্যবসা করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন।

ঠাকুর-পরিবার ব্যবসা করে অর্থবান হন, কিন্তু সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত সাজার জন্য জমিদার হয়েছিলেন। তবু কিন্তু ঠাকুর-বংশের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার কথা স্মরণ করার সময় আমরা আরেকটি নিঃশব্দ বেদনার কথা বিস্মৃত হতে পারি না। ব্রাহ্ম ঠাকুব-পরিবারের স্ব-বিরোধী রূপটি অনুধাবন করার জন্য সেই পটভূমিকা অনুসরণ করা প্রয়োজন। ঠাকুর-বংশ যদিও ব্রাহ্মণ বংশের উত্তরাধিকারী, তবু এই বংশ অতীতের একটি দুঃখজনক ঘটনার প্রতিফল হিসেবে ব্রাহ্মণ সমাজে "পতিত" বলে চিহ্নিত ছিলেন; পরিচিত ছিলেন "পিরালী ব্রাহ্মণ" হিসেবে।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ঠাকুর-বংশের আদিপুরুষ জগন্নাথ কুশারী "পিরালী" ব্রাহ্মণের কন্যা বিয়ে করে "পিরালী ব্রাহ্মণ" হয়েছিলেন। "পিরালী ব্রাহ্মণ" কেন, এবং কেন—পতিত? এ সম্পর্কে কোন পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না। তবে যতটা পাওয়া

যায়, তাতে জানা গেছে যে, এই বংশের জনৈক পূর্বপুরুষ ছিলেন দক্ষিণানাথ। দক্ষিণানাথের দুই পুত্র—কামদেব ও জয়দেব পিরল্যা খাঁ নামে এক তুর্কী খানজাহানের দেওয়ানের অধীনে কর্মচারী ছিলেন। এই পিরল্যা খাঁ জন্মসূত্রে ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং এক মুসলমান রমণীর প্রেমে পড়ে লোভ ও লালসার বশবর্তী হয়ে ধর্মান্তরিত হন। তাঁর নাম হয় তাহের। তাহেরের বাড়ি ছিল নবদ্বীপের নিকটবর্তী পিরলিয়া গ্রামে—সেই সূত্রেই সম্ভবতঃ পরিচিত হন পিরল্যা খাঁ নামে।

কথিত আছে, একদিন রোজার সময় পিরল্যা খাঁ একটি লেবুর ঘ্রাণ নিচ্ছিলেন। এমন সময় সেখানে উপস্থিত কামদেব ঠাট্টার সুরে বললেন: শাস্ত্র বলে, ঘ্রাণে অর্ধভোজন হয়, লেবুর গন্ধ নেওয়ায় আপনার রোজা নষ্ট হল। জন্মসূত্রে যিনি ব্রাহ্মণ, সেই পিরল্যা খাঁ বা পীর আলি কামদেবের এই ঠাট্টায় ভীষণ রেগে যান এবং কামদেবকে জব্দ করার জন্য মতলব আঁটতে থাকেন। কিছুদিন পরে পীর আলির গৃহে অনুষ্ঠিত এক জলসায় কামদেব প্রমুখ গ্রামের সকল ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেই জলসা-প্রাঙ্গণে নিষিদ্ধ খাদ্যের উগ্র গন্ধ ছিল প্রকট। উগ্র গন্ধে অস্বস্তি বোধ করে অনেকেই নাকে কাপড় চাপা দিলেন। চতুর পীর আলি তখন কামদেব ও জয়দেবকে জোর করে ধরে বলল: ঘ্রাণে যখন অর্ধভোজন, তখন নিষিদ্ধ মাংসের ঘ্রাণেও তোমাদের অর্ধভোজন হয়েছে। অতএব জাত গেছে। তারপর জোর করে তাঁদের ওই মাংস খেতে বাধ্য করে। এভাবেই এক হীন চক্রান্তে কামদেব ও জয়দেব জাতিচ্যুত হন এবং ওই জলসায় উপস্থিত কামদেব ও জয়দেবের সকল আত্মীয়কেই "পতিত" বা "পীর আলি" ব্রাহ্মণ আখ্যা দেওয়া হয়।

এই কামদেব রায়চৌধুরী ও তাঁর ভাইয়েরা—রতিদেব ও শুকদেব ওই ঘটনার পরিণতিতে দক্ষিণ ডিহি গ্রামে সামাজিক ব্যাপারে একঘরে হয়ে যান। কোন ব্রাহ্মণ পরিবার তাঁদের বোন মেয়েকে বধূ হিসেবে বরণ করতে রাজী হন না, আবার কোন ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়েকে

তাঁদের ঘরে দান করাও হয় না। এই অসহনীয় অবস্থায় বোন বা মেয়ের জন্য পাত্র যোগাড় করা একদিকে কষ্টসাধ্য, অন্যদিকে অর্থসাধ্য হয়ে পড়ে। অনেক সময় গরীব পরিবারের ছেলেকে অর্থের প্রলোভন দেখিয়েও জামাতা করতে হয়েছে। শুকদেব রায়চৌধুরীর এক মেয়ের সঙ্গেই পিঠাভোগের জমিদার শ্রোত্রিয় জগন্নাথ কুশারীর বিয়ে হয়। পতিত ব্রাহ্মণের মেয়েকে বিয়ে করার "অপরাধে" জগন্নাথের আত্মীয়-স্বজন তাঁকে ত্যাগ করেন এবং "পতিত" বলে ঘোষণা করেন। ফলে জগন্নাথকেও আত্মরক্ষার তাগিদে শ্বশুরালয়ে দক্ষিণ ডিহিতে চলে আসতে হয়।

আমরা আগেই দেখছি জগন্নাথের বংশধারা অনুসারে ঠাকুর বংশের আত্মপ্রকাশ।

দ্বারকানাথ ঠাকুর শিক্ষা-দীক্ষা ও অর্থে একজন নামী পুরুষ হিসেবে অভিনন্দিত হন সমকালীন সমাজে। তিনি ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে প্রথমবার বিলেতে যান এবং বিলেত থেকে ফিরে আসার পর আত্মীয়-স্বজনের ধর্মবিশ্বাসে যাতে আঘাত না লাগে সেজন্য বৈঠকখানা বাড়িতে বসবাস করতে থাকেন। অর্থাৎ নিজে একজন প্রগতিশীল মানুষ ছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাই বলে অপরের ধর্মমত বা বিশ্বাসে আঘাত করতেও রাজী ছিলেন না। তাঁর বিলাস ও বৈভবই তাঁকে "প্রিন্স" আখ্যায় ভূষিত করেছিল। প্রিন্সের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মাতা স্বধর্ম-পালনে আপসহীনা ছিলেন। মহর্ষির আত্মজীবনী থেকেই আমরা জানতে পারি যে, প্রিন্স সাহেবদের সঙ্গে খানা-পিনা শুরু করায় দেবেন্দ্রনাথ-জননী দিগম্বরী দেবী স্বামীর সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করেন এবং ব্রহ্মচর্য পালন করে স্বীয় জীবন দিয়ে প্রতিবাদ জানান।

দেবেন্দ্রনাথের বিয়ে হয় বারো বছর বয়সে সারদা দেবীর সঙ্গে। সারদার বয়স তখন ছয় কি সাত। যেহেতু দেবেন্দ্রনাথ পীরালি ব্রাহ্মণ, সেইজন্য তাঁকেও দক্ষিণ ডিহির রায়চৌধুরী পরিবারের কন্যাকেই পত্নী হিসাবে গ্রহণ করতে হয়। দেবেন্দ্রনাথের পিতা সাহেবী খানাপিনায় অভ্যস্ত হলেও পরিবারের অন্দর মহলে ছিল

গোঁড়া বৈষ্ণব পরিবেশ। পরিবারে মাংস অচল ছিল, প্রচলিত ছিল নিরামিষ খাদ্য।

এই পরিবেশে দেবেন্দ্রনাথ বড় হলেও যৌবনের প্রথম পর্বে গৃহকর্তা হওয়ার ফলে তিনিও অসংযত জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন; অবশেষে তাঁর একুশ বছর বয়সে পিতামহীর মৃত্যু তাঁর জীবনকে নতুন খাতে প্রবাহিত করে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল অপ্রতিরোধ্য এবং সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হলে দেবেন্দ্রনাথকেও কিছুটা বোঝা প্রয়োজন। পারিবারিক কারণে এবং সামাজিক ব্যাপারে "পীরালি ব্রাহ্মণ" দেবেন্দ্রনাথ স্বাভাবিক কারণেই হিন্দু সমাজের ওপর বিরক্ত ছিলেন। আবার বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণত্বের মোহ ত্যাগ করে একটা নতুন কোন ধারা সৃষ্টি করার প্রশ্নেও তিনি ছিলেন সংশয়াচ্ছন্ন। সেইজন্যই তিনি একদিকে যখন রামমোহনকে অনুসরণ করে "ব্রাহ্ম" হন, অন্যদিকে তখন অব্রাহ্মণ বলে কেশবচন্দ্র সেনকেও ব্রাহ্মসমাজের আচার্যপদে বরণ করতে আপত্তি জানান। "পীরালি ব্রাহ্মণ" হওয়ার বেদনা তাঁকে বিদ্ধ করেছে বলেই তিনি বংশানুক্রমিক এই অপমানের জ্বালা থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন নতুন একটা ধর্মমতের আশ্রয় নিয়ে—এমন কোন সিদ্ধান্তে যদি আসা যায়, তবে সেটা নিশ্চিত ভাবেই অযৌক্তিক হবে না। আবার জন্মগত সংস্কার বা ব্রাহ্মণত্বের ধারা থেকে বিচ্যুত হওয়ার দৃঢ় মানসিকতাও তাঁর ছিল না—এমন তথ্যও ঘটনা পরম্পরায় প্রমাণিত। এই স্ববিরোধিতার জন্যই দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং প্রত্যয়-হীনতার ফলেই ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আত্মঘাতী বিরোধিতার বীজ প্রকট হয়ে উঠেছিল।

সে যুগের ব্রাহ্ম-আন্দোলন ইয়োরোপ থেকে ভেসে আসা কিছু ধারণার জারক রসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। অষ্টাদশ শতকের ফরাসী দার্শনিক এবং হিউম প্রমুখ নিরীশ্বরবাদী লেখকগণ সে যুগের কিছু সংখ্যক বঙ্গজসন্তানকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু নাস্তিক্যবাদে আস্থা স্থাপন করতে পারেন নি, আবার ঈশ্বরের

অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয়বাদী হতেও রাজী হন নি। তিনি তাঁর বালক বয়সে রামমোহনকে দেখেছেন এবং স্বীয় ধর্মমত নির্ধারণে রামমোহনকে স্মরণ করেন। তাঁর বিশ্বাস হল: ঈশ্বর প্রতিমা নয়। অথবা, প্রতিমা ঈশ্বর নয়। এমন ধারণা কেন হল, এই উপলব্ধির পেছনে কোন সাধনার শক্তি বা সিদ্ধি লাভের ঘটনা আছে কিনা তা ইতিহাস থেকে জানা যায় না। তাঁর মনে হল, প্রতিমা ঈশ্বর নয় এবং সেইজন্যই তিনি স্বীয় ভাইদের নিয়ে শপথ করলেন: প্রতিমাকে আর প্রণাম নিবেদন নয়।

তারপর দেবেন্দ্রনাথ 'সর্বতত্ত্ব দীপিকা' নামক সভার সদস্য হলেন—যে সভার কাজ ছিল ধর্ম বিষয়ে আলোচনা। এ সময়ে দেবেন্দ্রনাথের বয়স একুশ বা বাইশ বছর, সময়টা ১৮৩৮-৩৯ সাল। একদিন তাঁর হাতে এল রামমোহন রায় কর্তৃক প্রকাশিত "ঈশোপনিষদে"র একটি অংশ—যাতে লিখিত ছিল:

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যাস্বিদ্ধনম্॥

এই শ্লোকটি তাঁকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করে। এই সময়েই তিনি "তত্ত্বরঞ্জিনী সভা" স্থাপন করেন, পরে যার নাম হয় "তত্ত্ববোধিনী সভা"। এর উদ্দেশ্য কি? "ইহার উদ্দেশ্য আমাদিগের সমুদয় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার"। ১৮৪২ সালে এই "তত্ত্ববোধিনী সভা"ই দেবেন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় ও প্রেরণায় ব্রাহ্মসমাজের ভার গ্রহণ করে। এসময় দ্বারকানাথ জীবিত আছেন। দেবেন্দ্রনাথ পিতার বিরাগভাজন হওয়ার ভয়ে বাড়িতে বেদান্ত-চর্চা না করে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে গিয়ে বেদান্তপাঠ করতেন। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হল, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাও প্রকাশিত হল—তবু কিন্তু সংস্কারের বেড়াজাল থেকে তাঁরা মুক্ত হতে পারলেন না। প্রতিষ্ঠা-লগ্নেই রোপিত হল স্ববিরোধিতার বীজ।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক হন। বাইরে যিনি অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে তৎপর, পরিবারের অভ্যন্তরে

তিনি পৌত্তলিকতা দূরীকরণে হন অগ্রসর। তাঁর ভাই গিরীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ভ্রাতৃবধূ ও ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় নগেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দনের সেবাকার্য যথানিয়মে চালিয়ে যেতে থাকেন। দেবেন্দ্রনাথ গৃহদেবতার সেবা বন্ধ করার কথা ঘোষণা করায় গিরীন্দ্রনাথের বিধবা পত্নী ও পুত্ররা বৈঠকখানা বাড়িতে গৃহদেবতাকে নিয়ে উঠে যান। অর্থাৎ, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়িতে একদিকে যেমন "অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্মে"র অভিষেক সম্পন্ন হল, অন্যদিকে সনাতন রীতিতে দেবপূজাও রইল অব্যাহত। পরবর্তীকালে দেখি, কঠোর হিন্দুমতে দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথের উপনয়ন সম্পাদিত হয় -- যা প্রচলিত সংস্কারের ফল।

দেবেন্দ্রনাথের এই "অপৌত্তলিক ধর্মমত" ঠাকুর-বাড়িতেই কতটা গৃহীত হয়েছিল—সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। তাঁর বিধবা ভ্রাতৃবধূ এবং ভ্রাতুষ্পুত্ররা যেমন সে ধর্মমত গ্রহণ করেন নি, তেমনি গ্রহণ করেন নি রবীন্দ্র-জননী সারদা দেবীও। এ ঘটনা আমরা রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের কথাতেই জানতে পারি (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১২) : সারদা দেবী ছিলেন নিষ্ঠাবান সাধারণ হিন্দুঘরের মেয়ে। ঠাকুর পরিবারের প্রাচীন লৌকিক হিন্দুধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে তাঁহার বাল্য ও যৌবনের প্রথম কয়েক বৎসর কাটিয়া যায়। ১৮৪৩ হইতে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ আঠারো বৎসর দেবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সংগ্রামের পর্ব। স্বামীর এই সংগ্রামের সহিত পত্নী সম্পূর্ণ সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে পারিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ, কারণ নানা আচার অনুষ্ঠানে তাঁহাকে প্রাচীন লোকাচারই অনুবর্তন করিতে দেখা যায়।

অর্থাৎ, দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় পত্নীকেও স্বধর্মে এবং স্বমতে পরিচালিত করতে সমর্থ হন নি। ফলে, ঠাকুর-পরিবারের অভ্যন্তরে "অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্মে"র প্রতিষ্ঠা যদি বা আনুষ্ঠানিকভাবে হয়েছিল, তবে সেটা অন্দরমহলে প্রবেশের ছাড়পত্র পায় নি। এই পরিবেশেই দেবেন্দ্র-নাথের পুত্র-কন্যারা বড় হয়েছেন, মানুষ হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের

যখন চৌদ্দ বছর বয়স, তখন তিনি মাকে হারান। অর্থাৎ, তাঁর কৈশোরে তিনি একই সঙ্গে পিতার কাছে শুনেছেন অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্মের কথা আর মাতার জীবনে দেখেছেন পৌত্তলিক ধর্মাচরণের নিষ্ঠা। এই দুই পরস্পরবিরোধী স্রোতধারার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ নিজের ধর্মমত ও ধর্মচিন্তাকে গড়ে তুলেছেন। সেইজন্য তাঁর জীবনেও আমরা তিনটি পর্যায় দেখি। একটা পর্যায়ে তিনি অপৌত্তলিক, দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি কট্টর ব্রাহ্মণ এবং পৌত্তলিক, আর শেষ পর্যায়ে তিনি মানবধর্মের পূজারী।

দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ কাব্যে, দর্শনে ও সংগীতে প্রতিভাধর ছিলেন। তিনি মেঘদূতের পদ্যানুবাদ করেন। দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ভারতে প্রথম আই সি এস। তিনিও 'গীতা' ও 'মেঘদূতে'র পদ্যানুবাদ করেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, সত্যেন্দ্রনাথের "প্রগতিশীল" চিন্তাধারার সামনে দেবেন্দ্রনাথও যেন "রক্ষণশীল" হয়ে পড়েছিলেন। অর্থাৎ, সত্যেন্দ্রনাথ স্ত্রী-স্বাধীনতা বা সমাজ-সংস্কার সম্পর্কে এমন সব নতুন কথা বলতেন, যা পরিবর্তনকামী হওয়া সত্ত্বেও দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয় নি। এখানে এ ব্যাপারে পিতা-পুত্রে একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল, যার ফলে সত্যেন্দ্রনাথ অন্যত্র সপরিবারে উঠে যান। সত্যেন্দ্রনাথ 'আমার বাল্যকথা' গ্রন্থে (পৃঃ ৩) দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলেছেন : বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কতকটা Conservative হয়ে পড়েছিলেন, বহুদর্শনের অভিজ্ঞতায় সাবধানে পা ফেলে মাটি পরীক্ষা করে চলতে চাইতেন : তখন নবীন বয়স –আমি ছিলুম ঘোর radical।

আমরা দেখতে পাচ্ছি দেবেন্দ্রনাথের চিন্তাধারা ঠাকুর-পরিবারের কারুর কারুর চোখে ছিল সনাতন রীতিনীতির পরিপন্থী, আবার উচ্চশিক্ষিত স্বপুত্রের চোখে ছিল রক্ষণশীল।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনাও উল্লেখযোগ্য। দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় কন্যাদের বিয়ে দিয়েছিলেন এমন সব পাত্রের সঙ্গে, যাঁরা নিজেদের সমাজ ত্যাগ করে এসে ঠাকুর-পরিবারে "ঘরজামাই" হওয়ার গৌরব

অর্জন করেন। এ সম্পর্কে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২২): ঠাকুর বাড়ির জামাতাদের প্রায় সকলেই ঘর-জামাই। তার বিশেষ কারণ ছিল; পীরালি ব্রাহ্মণ পরিবারের ব্রাহ্মণ-সন্তানগণ বিবাহ করিয়া পৈত্রিক সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেন, তখন জাত হারাইয়া ধনী শ্বশুরের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া তাঁহাদের গত্যন্তর থাকিত না।

এই ঘটনা নিশ্চিত ভাবেই দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়কে সূক্ষ্ম অনুশোচনা-বোধে বিদ্ধ করত এবং প্রচলিত সংস্কার ও ধর্মাচরণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে মানসিক দিক থেকে প্ররোচিত করত, কিন্তু তাই বলে সমাজ ও সংস্কারকে বিসর্জন দেওয়ার মত মুক্ত-মনা ব্যক্তিত্বের অধিকারীও তিনি ছিলেন না। ছিলেন না বলেই কোন অব্রাহ্মণের ঘরে কন্যা সম্প্রদান করতে রাজী হন নি, কোন অব্রাহ্মণের কন্যাকে বধূরূপে গ্রহণ করতেও সম্মত ছিলেন না।

এই প্রসঙ্গে আমরা রবীন্দ্রনাথের বিবাহ-ঘটিত বিষয়টি স্মরণ করতে পারি। "রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সুপুরুষের উপযুক্ত বধূ সংগ্রহের জন্য বহু চেষ্টা হয়; কিন্তু সংকীর্ণ পীরালি ব্রাহ্মণ সমাজে সেরূপ 'কন্যা' সুদুর্লভ। কারণ সে যুগে ছেলেদের বিবাহ হইত বিশ বৎসরের মধ্যে এবং বধূদের বয়স হইত নয়-দশের ভিতরে। রবীন্দ্রনাথের বয়স তেইশ পূর্ণ, সুতরাং তাঁহার জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্কা বালিকার সন্ধানে সবাই প্রবৃত্ত হইল। একবার এক অ-বাঙালী ধনী পরিবার হইতে বিবাহের প্রস্তাব আসে। বিবাহ সেখানে না হইয়া হইল ফুলতলি গ্রামের এগারো বৎসরের এক কৃশ, রুগ্ন, অশিক্ষিত, অত্যন্ত সাধারণ পাড়াগেঁয়ে বালিকার সঙ্গে। দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া লিখিলেন—বহু সন্ধানেও যখন সর্ববাদিসম্মতিক্রমে কোনো বধূ মিলিল না তখন স্থির হইল ঠাকুর এস্টেটের সামান্য কর্মচারী বেণীমাধব রায়চৌধুরীর একাদশ বর্ষীয়া কন্যার সহিত রবির বিবাহ হইবে। এক পীরালিত্ব ছাড়া আর কোন মিল ছিল না এই দুই পরিবারের মধ্যে।" রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ওই

বর্ণনার সঙ্গে আরও কিছু যুক্ত করে বলেন : কুলপঞ্জী অনুসারে কন্যার নাম ছিল ভবতারিণী। ঠাকুর বাড়ীতে নূতন বধূর ঐ পুরাণো ধরণের নাম একেবারে অচল, সুতরাং নূতন নামকরণ হইল মৃণালিনী এবং সেই নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন।···রবীন্দ্রনাথের ন্যায় প্রতিভাবান যুবকের উপযুক্ত নারী জগতে অলভ্য না হইলেও বাংলার ক্ষুদ্রগণ্ডী পীরালি-সমাজের ব্রাহ্মণশাখার মধ্যে যে দুর্লভ, তা' বলাই বাহুল্য। (প্রথম খণ্ড : পৃঃ ১৯২) হিন্দু-সমাজের মধ্যে অবস্থান করে নিজেদের এই দীনদশা স্বাভাবিক ভাবেই ঠাকুর-পরিবারকে বিব্রত করে তুলেছিল। সেইজন্য ব্রাহ্মধর্মের আশ্রয় নিয়ে সামাজিক সম্মান আদায় করার পথ ও পদ্ধতি তাঁদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে, এতে আর সংশয় কি থাকতে পারে ?

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্ববিরোধিতা এবং দুর্বলতা বারবার নানাভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। তিনি একসময় কেশবচন্দ্র সেনের খৃষ্টভীতি দেখে 'খৃষ্টভিত' নামে এক জোরালো ভাষণ দিয়েছিলেন। অথচ রবীন্দ্র-নাথের পত্নীকে 'আধুনিকা' করে তোলার জন্য তিনিই পৌত্তলিক ক্যাথলিকদের লরেটো হাউসে মৃণালিনী দেবীকে পাঠিয়েছিলেন। তাতে তাঁর আদর্শবাদিতা কিছুমাত্র বিঘ্নিত হয়নি।

১২৯১ সনের আশ্বিন মাস থেকে (১৮৮৪ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর) রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হন এবং এটা মহর্ষির ইচ্ছাতে হয়েছিল। কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মণ নন বলে আচার্য হতে পারেননি। আর রবীন্দ্রনাথকে এই পদে বসিয়ে দেবেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ ভাবে আদি ব্রাহ্মসমাজের ওপর ঠাকুর-বাড়ির নিয়ন্ত্রণকে নিশ্চিত রাখতেই চেয়েছিলেন।

১২৯১ সন (১৮৮৪ সাল) নানা কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ বছরই ২৫ পৌষ (৮ই জানুয়ারী) কেশবচন্দ্র সেন মাত্র ৪৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। হিন্দু সমাজে নতুন প্রাণবন্যার সঞ্চার ঘটে। একদিকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়ের অভূতপূর্ব বাণী, অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী হিন্দুসমাজের জড়দেহে যেন নতুন

প্রাণের প্রতিষ্ঠা করে। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই, যে গুরুবাদকে অস্বীকার করেই ব্রাহ্মধর্মের সৃষ্টি, সেই ব্রাহ্মধর্মের মধ্যেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ গুরুবাদ মাথাচাড়া দিতে থাকে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে "মহর্ষি" বানাতে একদল যেমন তৎপর হয়ে উঠলেন, আরেকদল তেমনি কেশবচন্দ্র সেনকে গুরুর আসনে বসাতে উদ্‌গ্রীব। ফলে ব্রাহ্মসমাজ আদর্শহীনতার শিকারে পরিণত হল এবং স্ব স্ব প্রধানের শাখা-প্রশাখায় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

"আদি ব্রাহ্ম সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে কোন প্রকার কালাপাহাড়ী বা radical মত পোষণ করিতেন না: তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্র বা তত্ত্ববিদ্যাদির আলোচনায় রত থাকিয়া মনে করিতেন তাঁদের ধর্মমতই হইতেছে মূল হিন্দুধর্ম সম্মত; আদর্শ হিন্দুর করণীয়। সেই জন্যই হিন্দুসমাজ-বিরোধী কোন অনুষ্ঠান তাঁহাদের সমর্থন বা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিত না। কেশবচন্দ্রের অসবর্ণ বিবাহ-আন্দোলন (১৮৭২) তাঁহাদের সমর্থন পায় নাই, বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহও তাঁহারা অনুমোদন করিতে পারেন নাই।" প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের এই উক্তির (পৃঃ ২০৩) পরিপ্রেক্ষিতে এটা সহজেই অনুমেয় যে, শুধু মূর্তিপূজাকে বাদ দিয়ে অন্য সব সংস্কার ও আচারকে সবলে ধারণ করে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নতুন কিছু করার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন, অথচ নতুন কিছু করবার মত শক্তির অধিকারী ছিলেন না।

তাই, পরবর্তীকালে আমরা মহর্ষির ধর্মভাবনার অনুসারী রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও কর্মে একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ যেমন পাই, তেমনি পাই একজন উদার মতাবলম্বীর—কিন্তু কোন অবস্থাতেই একজন সৎ ব্রাহ্মর সন্ধান পাই না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পৌত্তলিক ছিলেন—এমন কথা বলা যায় না, কিন্তু তাতে তাঁর হিন্দুত্ব বিসর্জিত হয় নি। রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তায় আমরা একজন এমন হিন্দুর সন্ধান পাই, যিনি আচার্য ঋষিদের মতই মানব ধর্মের কথা বলেন, আবার ঘোর পৌত্তলিকের মতই দেব-দেবীকে অবলম্বন করেন এবং এতসব করেই পিতার পথকে অনুসরণ করেন বিভ্রান্ত চিত্তে। ফলে আমরা

দেখি, উদার হয়েও তিনিই পিতার আদেশে অকালে মৃত বলেন্দ্রনাথের বিধবা স্ত্রীর দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধ করেন।

তাই আমরা দেখি, তিনি আবেগের বাহুল্যে এমন অনেক কথা বলেছেন, যা "পরে তিনি স্বয়ং বিনাদ্বিধায় বাতিল করতে কুণ্ঠিত হননি।" "রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক হইয়া নিজ কর্তব্য নিষ্ঠার সহিত পালনে ব্রতী হইলেন।" "নিষ্ঠা" প্রকাশের পথ কি? "প্রথমেই রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিলেন ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাসকে সমর্থন ও প্রচার করবার জন্য। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি বোধহয় নিজের বিভ্রান্তি সম্পর্কে সচেতন হন। তাই "লেখক পরবর্তী যুগে চারিত্র-পূজার মধ্যে (১৯০৭) রামমোহন রায় সম্বন্ধে এই দীর্ঘ প্রবন্ধের অনেকখানি বাদ দিয়াছিলেন; তিনি যে এককালে বিশেষ ভাবে ব্রাহ্ম ছিলেন, একথা সাহিত্যের বস্তু নহে বলিয়াই বোধহয় এই সব অংশ বাদ দিয়াছিলেন।" এক্ষেত্রে আমরা রবীন্দ্র-জীবনীকারের একটি উক্তি (পৃঃ ২০৭) লক্ষ্য করব। তিনি যে এককালে বিশেষ ভাবে ব্রাহ্ম ছিলেন। অর্থাৎ তিনি পরবর্তীকালে বিশেষভাবে ব্রাহ্ম ছিলেন না। বিশেষ করে ১৮৯৫ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত তাঁর জীবন গোঁড়ামি ও পৌত্তলিকতায় আচ্ছন্ন।

বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ মানবরূপে সৃষ্টি করেন—যা ব্রাহ্মরা সহ্য করতে পারেননি। অথচ কেশবপন্থী ব্রাহ্মরা অতিমাত্রায় গুরুভক্ত হয়ে পড়েন এবং সেটাই গুরুবাদ এবং পরিণামে অবতারবাদে মিশে যায়। "মহর্ষিকে"ও আদর্শ মানব সৃষ্টি করে সেই গুরুবাদকেই প্রচ্ছন্ন মহিমায় প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস দেখতে পাই, যার পেছনে রবীন্দ্রনাথের সমর্থন ছিল। কার্লাইলের Hero Worship এখানে নতুন রূপে প্রতিষ্ঠিত।

রবীন্দ্রনাথ যদিও দেবেন্দ্রনাথের ধারাকে বজায় রাখার জন্য একটা বাহ্যিক আবরণ পোষণ করতেন, কিন্তু বাস্তবে তিনি কতটা সেই ধারার বাহক তা নিয়ে বিস্তর সংশয় দেখা দেয়। শান্তিনিকেতনের উপাসনা গৃহটি 'মন্দির' নামে যখন ভূষিত হয়, তখন সেই মন্দিরে

দেহধারী দেবতা যদি বা উপস্থিত না থাকেন, তবু সেখানে এক অদৃশ্য দেবমূর্তি যেন স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। তা না হলে 'মন্দির' কেন নাম হয়? একদিকে হিন্দু-সমাজের অভ্যুদয়, অন্যদিকে ব্রাহ্ম সমাজের খণ্ড-বিখণ্ড রূপ—"আদি ব্রাহ্মসমাজ দোটানায় পড়িয়া আগাইল না—সে মরিয়া গেল।" প্রভাতকুমারের এই উক্তিটি যথার্থ।

তাই আমরা দেখি, আদি ব্রাহ্মসমাজ নিজেদের হিন্দু বলে পরিচিত করাতে সচেষ্ট। ১৮৯১ সালে এ দেশে সেন্সাস বা আদম স্নুমারী হয়েছিল। সে সময়ে ব্রাহ্মরা সেন্সাসে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত ও পরিচিত হওয়ার দাবী উত্থাপন করেন। এ ব্যাপারে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ সেন্সাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সি জে ও ডোনেল সাহেবকে প্রদত্ত এক পত্রে (৯ জানুয়ারী, ১৮৯১) জানান: The members of the Adi Brahma Samaj are really Hindus। এই মর্মে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রচ্ছদপটে একটি নোটিস প্রকাশিতও হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে যাঁরা হিন্দু, তাঁরা পৌত্তলিকতার বন্ধন কি ছিন্ন করতে পারেন? রবীন্দ্রনাথও পারেন নি।

"আদি ব্রাহ্মসমাজ বিবাহাদি ব্যাপারে বর্ণ বিচার করতেন, উপনয়নাদি বিষয়ে কুলাচার পালন করতেন"—শুধু নারায়ণ-শিলাকে সাক্ষী রাখতেন না। এটাও কি এক রকমের স্ববিরোধিতা নয়? অনেক হিন্দু পরিবারে সরস্বতীর প্রতিমা না বসিয়ে শুধু ঘট পূজা করা হয়। এটা কি অপৌত্তলিক অনুষ্ঠান? আদি ব্রাহ্মরা, অপৌত্তলিক সংস্কারমুক্তির কোন সাধ বা সাধ্য যাঁদের ছিল না, তাঁরা লোকদেখানো অপৌত্তলিক সেজেছিলেন। সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন শুধু স্ববিরোধিতায় আচ্ছন্ন, আবৃত।

গোপীনাথ ও রবীন্দ্রনাথ

পূর্ব-কথিত বক্তব্যের সূত্র অনুসরণ করে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বিষয়টি বোঝার জন্য দেবেন্দ্রনাথের ভূমিকাকে নির্মোহ দৃষ্টিতেই দেখতে হবে। তাই আবার স্পষ্ট করেই বলতে চাই : রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের মহিমা প্রচার এবং প্রতিষ্ঠার জন্যই মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। মূর্তিপূজা বা পৌত্তলিক অনুষ্ঠানকে পুরোপুরি বর্জন করার জন্য তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করেন। এ সম্বন্ধে তথ্যনিষ্ঠ বিবরণের জন্য আমরা রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে অনুসরণ করতে পারি। প্রভাতবাবু রবীন্দ্র-জীবনীতে (পৃঃ ১০) বলছেন : হিন্দুসমাজের পৌত্তলিক অনুষ্ঠানাদির সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রক্ষা করা কঠিন হওয়ায় তিনি (মহর্ষি) তাঁদের গৃহদেবতা লক্ষ্মী-জনার্দনের সেবা রহিত করিয়া দিলেন। অবশেষে বিগ্রহকে স্থানান্তরিত করিতে উদ্যত হইলে গিরীন্দ্রনাথের বিধবা পত্নী (গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথের জননী) উহার সেবার ভার গ্রহণ করিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার বাল্যকথা' থেকে আমরা জানতে পারি যে, গিরীন্দ্রনাথের বিধবা পত্নী গৃহদেবতাকে নিয়ে ভদ্রাসন ত্যাগ করেন এবং দ্বারকানাথের বৈঠকখানা-বাড়িতে দুই ছেলে ও দুই বৌ, দুই মেয়ে ও জামাই সহ উঠে যান (পৃঃ ৩৭-৩৮)।

এখানেই শেষ নয়। প্রভাতবাবুর কথায় আমরা আরও জানতে পারি : গৃহদেবতার পূজা বন্ধ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ বাটিতে সমবেত ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ে মনোযোগী হইলেন।

চণ্ডীমণ্ডপে দৈনিক ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্তিত হইল, প্রতিমার পীঠস্থানে উপাসনার বেদী নির্মিত হইল।… (দেবেন্দ্রনাথের) দ্বিতীয়া কন্যা সুকুমারীর বিবাহ হইল।…সুকুমারীর বিবাহে দেবেন্দ্রনাথ প্রাচীন

ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করিলেন; পৌত্তলিকতা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি তুলসীপত্র-বিল্বপত্র কুশ-শালগ্রামশিলা গঙ্গাজল ও হোমাগ্নি বর্জন করিয়া এক নূতন অনুষ্ঠানপদ্ধতি সংকলন করিলেন ও তদনুযায়ী কন্যার বিবাহ দিলেন। ··নিজগৃহে পূজাপার্বণ বন্ধ হওয়ায় ও অন্যের গৃহে পূজাদিতে নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করায় সাধারণ হিন্দুসমাজের সহিত ঠাকুর পরিবারের বিচ্ছেদটা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল (পৃঃ ১১)।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এতই অপৌত্তলিক হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি ঠাকুরবাড়ি থেকে গৃহদেবতা লক্ষ্মী-জনার্দনকে বিদায় করতেও দ্বিধা করেন নি। সেই সঙ্গে প্রতিমার পীঠস্থানে উপাসনার বেদী বানাতেও কুণ্ঠিত হন নি। এই যখন একদিকের ব্রাহ্ম-নায়ক দেবেন্দ্রনাথের ছবি, অন্যদিকে তখন দেখি, মহর্ষির ভাবধারায় অনুপ্রাণিত এবং মহর্ষির নির্দেশেই ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পুত্র রবীন্দ্রনাথ কত সহজে এবং কত আন্তরিক অনুরাগে শিলাইদহে গোপীনাথের সেবা করে চলেছেন। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ ভক্তিভরে গোপীনাথের বিগ্রহকে প্রণাম করছেন—এ প্রমাণও আমরা পাই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে। মহর্ষি স্বীয় কন্যার বিয়ে দেন 'অপৌত্তলিক মতে', আর মহর্ষিরই পুত্র রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে বড় দাদা সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথের অভিষেক সম্পন্ন করেন গোপীনাথের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে। লক্ষ্মী-জনার্দন আর গোপীনাথ—এ তো একই দেবতার দুই নাম।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন দেখা দেয়: রবীন্দ্রনাথ কি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি এবং শিলাইদহে দুই ভিন্ন চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত? "শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থ থেকে (পৃঃ ৩৫০-৫১) এখানে একটি চিত্র তুলে ধরতে চাই এবং এই চিত্রটা থেকেই সনাতন আদর্শে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ আমরা বুঝতে সক্ষম হব। গ্রন্থকার শচীন্দ্রনাথ অধিকারী বলছেন: রবীন্দ্রনাথ যখন নিজ পুত্র রথীন্দ্রনাথকে (আমেরিকা থেকে ফেরার পরে) জমিদারির কাজ শিক্ষার জন্য শিলাইদহে নিয়ে যান, তখন যুবক সুরেন্দ্রনাথকেও (বড় ভাই

সত্যেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র এবং রথীন্দ্রনাথের চেয়ে ১৬ বছরের বড়) শিলাইদহে নিয়ে যান ঐ উদ্দেশ্যে।…দুই ভাই শিলাইদহেই থাকেন; কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ নানা কাজে প্রায়ই কলিকাতা ছুটাছুটি করতেন, অথচ রথীন্দ্রনাথ সর্বদাই আপিস কাছারি নিয়ে ব্যস্ত। প্রজাসাধারণের মনে কেমন একটা সন্দেহ হল যে, সুরেন্দ্রনাথের ব্যাপারটা লোকদেখান কৌশল মাত্র। মনুষ্যচরিত্রাভিজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ ভাবটা টের পেলেন।

…হঠাৎ একদিন কুঠিবাড়িতে একটা উৎসবের আয়োজনের মত মনে হল। ব্যাপারটা ম্যানেজারবাবু ভিন্ন আর কেউ বুঝতে পারলেন না। ষোল বেহারার বড় পালকিটা বের হল, কুষ্টিয়া থেকে ব্যাগ-পাইপের দল আনা হল, সদর কাছারি সাজাবার হুকুম হল। খুব ভোরে সুরেনবাবু স্নান করে গরদের ধুতি পাঞ্জাবি চাদর পরে ফুলের মালা গলায় দিয়ে সুসজ্জিত পালকিতে চেপে বসলেন। বিশ-ত্রিশ জন বরকন্দাজ ও বাদ্যভাণ্ডসহ সুরেনবাবুকে নিয়ে পালকি চলল গ্রামের অধিষ্ঠাতা দেববিগ্রহ গোপীনাথের মন্দিরে। তিনি গোপীনাথের আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন। গ্রামের কেন্দ্রস্থলে গোপীনাথ মন্দির, গ্রামময় হৈ চৈ পড়ে গেল। ব্যাপার কি? শেষ পর্যন্ত বোঝা গেল সুরেনবাবুর অভিষেক।

এইখানে প্রসঙ্গত কিছু কথা বলা আবশ্যক। শিলাইদহ ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির অধিষ্ঠাতা দেব-বিগ্রহ গোপীনাথজীর সেবাপূজা পরিচালনা করতেন ঠাকুর-জমিদার. সেবাইত সূত্রে। হিন্দু সম্প্রদায়ের ধনী নির্ধন সকল গৃহস্থের এই সুপ্রাচীন প্রথা ছিল যে, বিবাহ ও অন্নপ্রাশন (বিজয়া দশমীর দিনও বটে) উপলক্ষে বর-কনে এবং শিশুপুত্র বা কন্যা গোপীনাথ ঠাকুরের মন্দিরে শোভাযাত্রা করে গিয়ে দেবতার নির্মাল্য আশীর্বাদ গ্রহণ করে বিবাহ-যাত্রা করবে বা অন্ন মুখে দেবে। সে প্রথা এখনও চলছে। ঠাকুর পরিবার ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী হলেও গ্রামীণ ঐ প্রাচীন প্রচলিত ঐতিহ্য সংস্কার বা প্রথা মান্য করতেন প্রজাদের মতই। রবীন্দ্রনাথ গোপীনাথ মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করতেন জুতো বাইরে রেখে, খালি পায়ে। এলম্‌হার্স্ট সাহেব জুতো ছেড়ে

গোপীনাথ মন্দিরের কাজ দেখতেন। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ নববধূসহ শিলাইদহে এসে প্রথমেই গোপীনাথের আশীর্বাদ গ্রহণ করেছিলেন, এ ঘটনা আমরা দেখেছি। প্রণামী ছিল এক টাকা বা আট আন্না, আশীর্বাদী ছিল চরণামৃত গ্রহণ ও 'লালচি' (হিন্দুদের পূজায় লাগে শিবের জোড়) মাথায় বেঁধে বিগ্রহ প্রণাম করা। ..

সুরেন্দ্রনাথ পালকি চেপে শোভাযাত্রায় সারা গ্রাম সচকিত করে সদর কাছারিতে এলেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে আগে থেকেই তাঁর প্রতীক্ষা করছিলেন। ম্যানেজারবাবু মাল্যদান ও প্রণাম করে অন্যান্য আমলাগণ সহ সুরেন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানালেন, রবীন্দ্রনাথ ভাইপোকে কপালে চন্দন ও ধানদূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর এই বর্ণনা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। দেবেন্দ্রনাথ বেলপাতা আর কুশ বর্জন করেন, রবীন্দ্রনাথ ধানদূর্বা ও চন্দন গ্রহণ করেন।

কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ শিলাইদহে এসেই গোপীনাথের আশীর্বাদ গ্রহণ করেছিলেন এবং এটা তিনি নিশ্চিতভাবেই পিতার অনুমোদনে করেছিলেন। সেই আশীর্বাদ ছিল 'চরণামৃত' গ্রহণ ও 'লালচি' মাথায় বেঁধে বিগ্রহ প্রণাম করা—যা রথীন্দ্রনাথ করেছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় কন্যার বিয়েতে গঙ্গাজল আর শালগ্রামশিলা বর্জন করেন, আর মহর্ষির পৌত্র নববধূকে নিয়ে চরণামৃত গ্রহণ করেন। এটা কি স্ববিরোধিতা, অথবা বাইরের রূপ আর ভিতরের রূপের পরস্পর বিরোধিতা? কলকাতায় তাঁরা এক আচরণ করতেন, ভিন্ন আচরণ করতেন দূরে, শিলাইদহে।

গোপীনাথের প্রসাদ গ্রহণ করাটাও যে শিলাইদহের ঠাকুরবাবুদের সংসারে প্রচলিত ছিল, সেটাও ঘটনা। শিল্পী নন্দলাল বসু শিলাইদহে গিয়ে এক মাসেরও বেশি সময় ছিলেন। সে সময়কার কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন (শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৩৫৪): সন্ধ্যাবেলায় আমাদের জলখাবারের জন্য প্রায় প্রত্যহ গোপীনাথ মন্দির থেকে শীতলী প্রসাদ আসতো। নন্দলাল ছিলেন রবীন্দ্রনাথের

প্রিয়পাত্র এবং আপনজন। সেইজন্যই ঠাকুরের প্রসাদ পাবার ব্যবস্থাটা তিনিও লক্ষ্য করেছেন।

এই যে গোপীনাথ মন্দির—যার সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা ছিল অবিচ্ছেদ্য—সেই মন্দিরের একটা ইতিহাস আছে, আছে একটা কাহিনী। এই প্রসঙ্গে সেটাও স্মরণ করা সঙ্গত।

শিলাইদহের গোপীনাথ মন্দির সম্পর্কে আমরা শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর বিবরণ (পৃঃ ৭) অনায়াসেই অনুসরণ করতে পারি। তিনি বলেছেন: শিলাইদহের ভদ্রপল্লী রবীন্দ্রনাথের আমলে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কুমার, কর্মকার, সূত্রধর, গোপ, জেলে, তাঁতি প্রভৃতি জাতির দ্বারা পূর্ণ ছিল।...গ্রামের বিশিষ্ট প্রসিদ্ধি ও আকর্ষণ ছিল গোপীনাথের মন্দির ও খোরসেদ ফকিরের দরগা।...গোপীনাথদেবের রথ ছিল প্রকাণ্ড কাঠের তৈরি।...গোপীনাথ-বাড়ির সংস্কার করে, ঐ দেব-মন্দিরের (তিনি) অতিথিশালা, কাছারি ও সিংদরজা তৈরি করে গ্রামের সৌন্দর্যবৃদ্ধি করেন।...তাঁর সময়ে কাছারিতে পুণ্যাহ ও গোপীনাথদেবের পালাপার্বণে, জানিপুরের বিখ্যাত শিবু সাহার কীর্তন, লালন ফকিরের বাউলগান ও যাত্রা থিয়েটারের অনুষ্ঠানে নিরানন্দ পল্লী সঞ্জীবিত হয়ে উঠত।

শিলাইদহের গোপীনাথদেবের সেবাপূজায়, যেখানে ঠাকুরবাবুরা বহু সহস্র মুদ্রা খরচ করতেন, অতিথিসেবা করতেন, সেই পল্লীবিগ্রহ আজ নৈবেদ্যের চালে তুষ্ট হয়ে মন্দিরে বসে কাঁদছেন (শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৩২)। একসময় ছিল, যখন গোপীনাথদেবের মন্দির ও বিগ্রহের স্নানযাত্রার মেলার জন্য এই পল্লীটি (ছিল) সুবিখ্যাত (ঐ: পৃঃ ৬৪)।

রবীন্দ্রনাথ "দুই বিঘা জমি" কবিতায় বর্ণনা দিয়েছেন: রাখি হাটখোলা নন্দীর গোলা, মন্দির করি পাছে / তৃষাতুর শেষে পঁহুছিনু এসে আমার বাড়ির কাছে। এই বর্ণনায় হাটখোলা, নন্দীর গোলা আর মন্দির সেই শিলাইদহেরই। শিলাইদহ গ্রামে প্রবেশ করতে হলে সকল পথিককেই এই তিনটি স্থান অতিক্রম করতে হবে।

প্রথমেই ছিল শিলাইদহের কুঠির হাট বা হাটখোলা—যা এখন পদ্মাগর্ভে বিলীন, চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট নেই। তারপরেই ছিল লালনচন্দ্র নন্দীর গোলা। গোলা ছাড়িয়ে আরেকটু গ্রামের দিকে এগুলেই মন্দির, গোপীনাথদেবের মন্দির। সেকালে অনেক দূর থেকেই গোপীনাথের মন্দির দুটি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করত।

এই গোপীনাথদেবের মন্দির নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠার পেছনে কিছু ইতিবৃত্ত নির্বাক হয়ে আত্মপ্রকাশের জন্য অপেক্ষা করছে। এখানে সেই দূর অতীতের প্রসঙ্গ সঙ্গত কারণেই কিছুটা উল্লেখের দাবি রাখে। প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে, রাজা সীতারাম রায়ের আমলে নদীয়া জেলার উত্তর সীমানায় কীর্তিনাশা নদীর তীরে পাশাপাশি দুটি গ্রাম কল্যাণপুর এবং শিলাইদহের সন্ধান পাই, যদিও আদিতে শিলাইদহ নামে কোন গ্রাম ছিল না। ছিল খোরসেদপুর গ্রাম। খোরসেদ ছিলেন এক বিখ্যাত মুসলমান ফকির। পরে কীর্তিনাশা পদ্মার কোন একটি অংশ বা দহের (নদীর খাদ) নাম অনুসারেই নাম হয় শিলাইদহ। শিলাইদহ কেন? সেখানে এক নীলকর সাহেব ছিলেন, ছিল তাঁর কুঠি, নাম ছিল যাঁর শেলী। এই কুঠির বর্ণনা আমরা রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' গ্রন্থেও পাই। পরে শেলী সাহেবের নাম থেকে হয় শেলীদহ এবং অবশেষে শিলাইদহ।

এখন সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত সেই কল্যাণপুরের জমিদার ছিলেন কল্যাণ রায়—যিনি জাতিতে ছিলেন তাঁতি এবং বিপুল বিত্তের অধিকারী। তাঁর বিশাল প্রাসাদ এবং কীর্তি এখন কীর্তিনাশার গর্ভে। তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব। সস্ত্রীক তিনি দেবতার আরাধনা করলেন একটি পুত্র কামনায়—কিন্তু সব বিফলে গেল। শেষটায় শান্তির আশায় নদীপথে তিনি গেলেন কাশীধামে—তীর্থ করতে।

কাশীতে গিয়ে তাঁরা যাঁর আতিথ্য গ্রহণ করলেন, তিনি ছিলেন একজন ভাস্কর, পাথরের মূর্তি গড়েন, প্রতিমা গড়েন। একদিন রাত্রে একই সঙ্গে কল্যাণ রায় ও তাঁর স্ত্রী স্বপ্ন দেখলেন, দেখলেন তাঁদের সামনে সুন্দর এক কৃষ্ণমূর্তি। হাতে বাঁশি, মাথায় চূড়া,

গলায় মালা, পায়ে নূপুর। সেই বৃন্দাবনের গোপাল। পরদিন সকালে তাঁরা গৃহস্বামী সেই ভাস্করকে স্বপ্নে দেখা মূর্তির কথা বললেন, বললেন, "গোপবেশে বংশীধারী" কৃষ্ণ এবং রাধার মূর্তি তৈরি করে দিতে। ভাস্কর রাজি হলেন। তাঁরা তীর্থ পরিক্রমায় কাশী থেকে চললেন পুরী—কল্যাণপুরে ফেরার পথে মূর্তি নিয়ে যাবেন।

এদিকে সেই ভাস্কর যখন মূর্তি গড়ার কাজ শেষ করেছেন, গড়েছেন এক অপরূপ যুগল-মূর্তি, ঠিক তখনই কাশীর কোন একজন রাজা সেই মূর্তি দুটি দাবি করলেন। সেই রাজা কৃষ্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠা করবেন—কিন্তু হাতে সময় নেই, তৈরি করার মত সময় দিতে রাজি নন। তাই এই যুগলমূর্তি তাঁর চাই-ই, যত দাম লাগে, যত বল প্রয়োগ করতে হয়। ভাস্কর প্রথমে অস্বীকার করেন, কিন্তু পরে চাপের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হন। শেষ পর্যন্ত কল্যাণ রায়ের জন্য তৈরি করা সেই বিগ্রহ ওই রাজার মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হল।

পুরী দর্শন শেষ করে কথামত নির্দিষ্ট সময়ে কল্যাণ রায় এলেন কাশীতে। উপস্থিত হলেন সেই ভাস্করের বাড়িতে। ইতিমধ্যে ভাস্কর কল্যাণ রায়ের জন্য আরেকটি যুগলমূর্তি তৈরি করে ফেলেছেন। অবশ্য তাড়াতাড়ি কাজ করতে গিয়ে তিনি দ্বিতীয় মূর্তিটি আগের মূর্তির চেয়ে কিছুটা ছোট করে ফেলেন। কল্যাণ রায় ছোট মূর্তি দেখে একটু দুঃখিত হলেন ঠিকই, তবে এটা যে দ্বিতীয় মূর্তি, তা আদৌ বুঝতে পারেন নি। তিনি রাধা-কৃষ্ণের মূর্তি নিয়ে কল্যাণপুরে ফিরে এলেন। মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। মহাসমারোহে পূজা-অর্চনা চলতে থাকে।

এদিকে কাশীর সেই রাজা স্বপ্নে দেখেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বলছেন, আমার পরম ভক্ত কল্যাণ রায়ের মূর্তি তুই এনেছিস কেন? এখনই ফিরিয়ে দিয়ে আয়। শেষটায় সেই রাজা কল্যাণপুরে এসে কল্যাণ রায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে ফিরিয়ে দিয়ে যান প্রথমে গড়া সেই যুগলমূর্তি।

পরম বৈষ্ণব কল্যাণ রায় প্রথমে গড়া মূর্তি পেয়ে দারুণ খুশী—

কারণ এই মূর্তিই যেন তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন। এই যুগলমূর্তির নাম রাখলেন গোপীনাথ ও গোপীরাণী। আর ছোট মূর্তির নাম রাখলেন রাধানাথ ও রাধারাণী। কল্যাণ রায় ও তাঁর স্ত্রী এই দুইজোড়া দেবতাকে পেয়ে ভুলেই গেলেন সন্তানহীনতার দুঃখ-বেদনা।

তারপর একদিন কীর্তিনাশা পদ্মা ভয়ঙ্কর মূর্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল কল্যাণ রায়ের প্রাসাদ, মন্দির এবং সম্পদের ওপর। কল্যাণ রায় ও তাঁর স্ত্রী সবকিছু ছেড়ে, সবকিছু ফেলে শুধু প্রাণের ঠাকুরকে বুকে নিয়ে পালিয়ে এলেন প্রাসাদ থেকে। কিন্তু কোথায় তাঁরা আশ্রয় পাবেন, কে তাঁদের আশ্রয় দেবে ? এসে আশ্রয় নিলেন খোরসেদপুর গ্রামে এক বিশাল বটের ছায়ায়। সেখানেই তাঁরা ঘর তুললেন, বানালেন গোপীনাথ আর রাধানাথের আশ্রয়। খড়ের ঘরে তাঁরা সংসার পাতলেন, মন্দির গড়লেন।

একদিন রাজা সীতারাম রায় নিজের জমিদারি পরিদর্শন করতে ওই গ্রামে এসে হাজির হলেন। দেখলেন : খড়ের ঘরে দেবতা-ভক্তের সোনার সংসার। রাজা মুগ্ধ হলেন মূর্তি দেখে, বিস্মিত হলেন ভক্তপ্রাণ কল্যাণ রায়কে দেখে।

সীতারাম রায় ওই বটগাছের সামনেই দীঘি কাটিয়ে দিলেন, গড়ে দিলেন দুটি মন্দির, রান্নাঘর, অতিথিনিবাস এবং পুরোহিত ও সেবকদের ঘর। এই দীঘিটিই আজ শিলাইদহে গোপীনাথের দীঘি নামে বিখ্যাত। রাজা সীতারাম রায় দেব-সেবার জন্য বছরে এক হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি দিলেন, আর তৈরি করলেন একটি সুন্দর রথ। ওই রথ আর নেই—তবে রথের অবশিষ্ট হিসেবে কয়েকটি কাঠের পুতুল এখনও আছে।

মহাকালের নিয়মে কল্যাণ রায় বৃদ্ধ হলেন। আর গোপীনাথের সম্পত্তি ও এই পরগণা নাটোরের রানী ভবানীর এক্তিয়ারে চলে গেল। রানী ভবানীই একটি সুন্দর মন্দির তৈরি করে এক মন্দিরে দুইজোড়া বিগ্রহকে এনে প্রতিষ্ঠা করেন। এখন সেই শ্রীমন্দির রূপময় হয়ে উঠল, আর রাজা সীতারামের গড়া মন্দির দুটি নিঃসঙ্গ ও শূন্য

হয়েই পড়ে রইল। কল্যাণ রায়ের মৃত্যুর পর রানী ভবানীর পুত্র রাজা রামজীবন গোপীনাথের সেবা ও পূজার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এর পরের ইতিহাসে আমরা দেখি, রাজা রামজীবনের জমিদারি নীলামে উঠল। সেই জমিদারি, বিরাহিমপুর পরগণা এবং গোপীনাথের সম্পত্তি প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর কিনে নেন। কল্যাণ রায়ের ঠাকুর এবার থেকে ঠাকুর-পরিবারের ঠাকুরে পরিণত হল এবং প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরই এই গোপীনাথ ও রাধানাথের সেবাপূজার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, "নিরাকারবাদী" রবীন্দ্রনাথই এই কিংবদন্তীখচিত এবং বিখ্যাত মন্দিরের সংস্কার এবং সন্নিহিত ভবনগুলির মেরামতি করান।

একদা খোরসেদপুরের বিখ্যাত গোপীনাথই কালক্রমে শিলাইদহের গোপীনাথ হয়ে যান। গোপীনাথের স্নানযাত্রার দিনে এখানে অসংখ্য মানুষ আসেন। কল্যাণ রায়ের গোপীনাথ রবীন্দ্রনাথের সেবায় সমহিমায় বেঁচে রইলেন, হারিয়ে গেলেন কল্যাণ রায়। এটাই ইতিহাসের পরিহাস।

এই ইতিহাস বিচ্ছিন্নভাবে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। তবে এই প্রসঙ্গে শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর বর্ণনা থেকে আমরা আরও জানতে পারি : ঠাকুরবাবুরা ব্রাহ্মসমাজের হলেও ঐ বাবদ (ঠাকুরসেবা) বার্ষিক তিন হাজার টাকা দিতেন···। ঠাকুরবাড়ির সিংদরজা নির্মাণ করার সময় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ গোপীনাথের মন্দির থেকে কারুকার্যময় ইট আনিয়ে সেই ইট সিংদরজায় বসিয়েছিলেন।···ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী হয়েও ঠাকুর-বাবুরা স্থানীয় হিন্দু জনসাধারণের অধিষ্ঠাতা দেবতার সেবাপূজা অনুষ্ঠানাদির যথেষ্ট উন্নতি করেছিলেন (পৃঃ ৩৭৫)।

শিলাইদহে ভগিনী নিবেদিতা, জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও গেছেন। গোপীনাথের মন্দিরে প্রণাম করেছেন। 'রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহ' গ্রন্থের বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি (পৃঃ ১৭৯) : ১৩০৯ কি ১৩১০ সালে যখন রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসাধনার সঙ্গে পল্লীজীবনের উন্নতির নানা চিন্তায় ও কাজে লিপ্ত ছিলেন, তখন

তাঁর আমন্ত্রণে ভগিনী নিবেদিতা এবং আরও একজন আমেরিকান মহিলা (তাঁর নাম জানতে পারি নি) শিলাইদহে গিয়েছিলেন এবং প্রায় ১৫।২০ দিন শিলাইদহে ছিলেন। বর্ণনায় দেখি :

…কাছারির জনৈক আমলা দক্ষিণারঞ্জন চৌধুরীর ডাক পড়ল রবীন্দ্রনাথের বোটে। দক্ষিণাবাবুকে রবীন্দ্রনাথ ডেকে বললেন, কাল থেকে এঁরা দু'জনে গ্রাম দেখতে আরম্ভ করবেন…। জান তো, ইনি হলেন ভগিনী নিবেদিতা— রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের শিষ্যা।

একদিন সকালে ভগিনী নিবেদিতা গেলেন শিলাইদহের সেই বিখ্যাত গোপীনাথ ঠাকুরের মন্দির ও দেব-দর্শন করতে। আগে-ভাগেই খবর দেওয়া ছিল বলে বিগ্রহের পূজকেরা মন্দিরের বারান্দায় বিগ্রহদম্পতিকে একটা কাঠের সিংহাসনে সাজিয়ে রেখেছিলেন। দুই বিদেশিনীই বাইরে জুতো খুলে বিগ্রহকে প্রণাম করলেন মাটিতে নুয়ে। দুই হাত পেতে বিগ্রহের চরণামৃত পান করলেন।

গোপীনাথের প্রাচীন মন্দির দুটি রাজা সীতারাম রায়ের তৈরি, নূতন মন্দিরটি রানী ভবানীর তৈরি। মন্দির ক'টিই ভগিনী তন্ন তন্ন করে দেখলেন। সেকালের নানা শিল্পকলার নিদর্শন রয়েছে সেই মন্দিরের পাতলা ইটগুলিতে। স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায় যে, নিবেদিতার মন্দিরে যাওয়ার এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সম্মতি ছিল।

কাত্যায়নী মেলা

শুধু মাত্র গোপীনাথ নয়, হিন্দু দেব-দেবীর নাম ও প্রতিমার প্রতি কবির যে একটু বিশেষ প্রীতি ছিল, সেটা এই ঘটনাতেই প্রমাণিত। শচীন্দ্রনাথ অধিকারী বলেছেন: কবি-জমিদার মাথা ঘামাচ্ছেন শিলাইদহে খুব প্রকাণ্ড একটা মেলা করতে হবে।·· পাঁজিপুঁথি শাস্ত্র-পুরাণ ঘেঁটে কিছু হল না। দারুণ উৎসাহ, দেরি হলে হয়ত জুড়িয়ে যাবে। ভেবে-চিন্তে ঠিক হল "কাত্যায়নী"র মেলা হবে। মা দুর্গাই কাত্যায়নী। শীত পড়েছে, কিন্তু মা দুর্গার মতই প্রতিমা তৈরি হল কাত্যায়নীর। সে যে কী বিরাট বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা, কি বলব !

গোপীনাথ মন্দিরের সামনে "খোলাচে" প্রকাণ্ড মণ্ডপ তৈরি হল, প্রতিমা তৈরি হল। সময়ের অভাব, তাই রাত্রে গ্যাসের আলো জ্বালিয়ে গাঁয়ের মুরুব্বি, ছেলে-বুড়ো সবাই খাটছেন। আহার-নিদ্রা ভুলে গেছেন। যাত্রা, থিয়েটার, পাঁচালি, কবি, তরজা, কীর্তন, বাউল ইত্যাদির বিরাট আয়োজন সাতদিন ধরে। মেলা দীর্ঘদিন চলবার জন্যে কেউ বললেন, মেলার নাম হোক 'করোনেশন মেলা' (১৯০২ সালে সপ্তম এডওয়ার্ডের 'করোনেশন' উৎসব স্মরণ করে)। রবীন্দ্রনাথের তাতে ঘোর আপত্তিতে নাম হল "কাত্যায়নী মেলা"। এইভাবে বিরাট মেলা হল পর পর তিন বছর।

তারপর 'কাত্যায়নী মেলা' গেল উঠে ; রবীন্দ্রনাথের মাথার মধ্যে ঐ স্বদেশী মেলার নানা কল্পনা তখনও জাল বুনছে। দু-তিন বছর যেতেই আবার তাঁর প্রস্তাব, আবার অন্যখানে অন্য মেলা হবে ; এবার হল রাজরাজেশ্বরীর মেলা। তখন ম্যানেজার ছিলেন বিপিন বিশ্বাস, অদ্ভুত মানসিক শক্তিতে শক্তিমান পুরুষ। তিনি একাই একশো। দশমহাবিদ্যার "ষোড়শী" মূর্তি হল। নূতন করে প্রকাণ্ড পাকা মণ্ডপ তৈরি হল

মেলা হল পনেরদিনব্যাপী। কাত্যায়নীর মেলা ও রাজরাজেশ্বরীর মেলা উপলক্ষে রবীন্দ্র-বন্ধু আচার্য জগদীশচন্দ্র ও নাটোররাজ জগদিন্দ্রনাথ এসেছিলেন; এঁরা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজন অনেকে এসেছিলেন; কৃষ্ণনগর, কুষ্ঠিয়া থেকেও হোমরা-চোমরা হাকিমরা এসেছিলেন।

গোপীনাথদেবের প্রতি বিশেষ অনুরাগ রবীন্দ্রনাথের আসল রূপটাকেই স্পষ্টতর করে তোলে এবং বাইরে ব্রাহ্ম ও ভিতরে সনাতন হিন্দুর আত্মবিরোধটাকে করে তোলে নগ্ন। তাই তথাকথিত অপৌত্তলিক হয়েও তিনি মূর্তি গড়িয়ে মেলা করেন কাত্যায়নীর নামে, রাজরাজেশ্বরীর নামে—বাতিল করেন 'করোনেশন' মেলার প্রস্তাব। এসবই কি তাঁর অপৌত্তলিক অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না? মনে-প্রাণে কট্টর ব্রাহ্মণ এবং সনাতন হিন্দু আদর্শে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ শুধু পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে ব্রাহ্ম সেজেছিলেন - যেটা কার্যকারণ বিচারে এবং বাস্তব অবস্থায় ছিল তাঁর নিতান্তই সাজ।

রবীন্দ্রনাথের চোখে রামকৃষ্ণ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ চিড়িয়াখানায় গিয়ে সিংহ দেখেছিলেন, একথা কথামৃতেই উল্লিখিত আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সিংহকে মায়ের বাহন হিসেবেই দেখেছিলেন। এই ঘটনার কথা সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের শ্রুতিগোচরও হয়েছিল, 'একেশ্বরবাদী' ও 'নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই ব্যাকুলতা প্রকাশের যৌক্তিকতা সম্পর্কে কটাক্ষ করেন তাঁর 'রূপ ও অরূপ' প্রবন্ধে।

অবশ্যই কবি উক্ত প্রবন্ধে স্পষ্ট করে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম উল্লেখ করেননি, কিন্তু বাক্যবাণের ইঙ্গিতে ঠাকুরকেই বিদ্ধ করতে চেয়েছেন। সে সময়ে এই প্রসঙ্গটি নিয়ে নানা মহলে আলোচনার তাপ ও উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়েছিল নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের সামনে। উত্থাপন করেছিলেন কুমুদবন্ধু সেন, যিনি ছিলেন গিরিশচন্দ্রের একান্ত অনুরাগী ও সাহচর্যে ধন্য এবং পরবর্তী কালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গিরিশ অধ্যাপক। অধ্যাপক কুমুদবন্ধু সেন রচিত 'গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য' নামক গ্রন্থে এই প্রসঙ্গটি উল্লিখিত এবং এই 'গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য' নামক অধুনা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল রসচক্র সাহিত্য সংসদের (১৫নং রাজা বসন্ত রায় রোড) পক্ষ থেকে। উক্ত গ্রন্থে কুমুদবন্ধু সেন স্বীয় অভিজ্ঞতা ও স্বকর্ণে শ্রুত বিষয় ও বক্তব্য স্মৃতিচারণ করে পৌত্তলিকতা এবং এ ব্যাপারে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ ও গিরিশচন্দ্রের মতামত প্রকাশ করেন। অধ্যাপক সেনের বয়ান থেকে জানা যায় যে, উক্ত প্রসঙ্গটি যেদিন গিরিশধামে উত্থাপিত ও আলোচিত হয়, সেদিন আলোচনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং কুমুদবন্ধু, গিরিশচন্দ্র এবং ডাক্তার কাঞ্জিলাল।

'গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য' গ্রন্থের ১১৩ পৃষ্ঠা এবং পরবর্তী তিন-চার পৃষ্ঠা ব্যাপী প্রসঙ্গটি বিন্যস্ত। বিষয়টি যথাযথভাবে বোঝার জন্য

এবং আনুপার্বিক সূত্র বজায় রাখার প্রয়োজনে আমরা উক্ত আলোচনার গতিধারাকেই নিষ্ঠা সহকারে অনুসরণ করতে চাই।

তার আগে আমরা প্রাসঙ্গিকতার প্রয়োজন এবং সামগ্রিকভাবে বিষয়টিকে অনুধাবন করার স্বার্থে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি একটু স্মরণ করে নিতে পারি। রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়' নামক গ্রন্থে (রবীন্দ্র-রচনাবলী—১৮) রূপ ও অরূপ-শীর্ষক প্রবন্ধটি সংযোজিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : বর্তমানকালে আমাদের শিক্ষিত লোকরা যখন প্রতিমাপূজার সমর্থন করেন তখন তাঁহারা বলেন প্রতিমা জিনিসটা আর কিছুই নহে, উহা ভাবকে রূপ দেওয়া। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যে বৃত্তি শিল্পসাহিত্যের সৃষ্টি করে ইহাও সেই বৃত্তির কাজ। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে কথাটা সত্য নহে। দেবমূর্ত্তিকে উপাসক কখনও সাহিত্য হিসেবে দেখে না। কারণ, সাহিত্যে আমরা কল্পনাকে মুক্তি দিবার জন্যই রূপের সৃষ্টি করি, দেবমূর্ত্তিতে আমরা কল্পনাকে বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকি।

কবি আবার বলেছেন : তবে কেন কোনো কোনো বিদেশী ভাবুকের মুখে আমরা প্রতিমা পূজার সম্বন্ধে ভাবের কথা শুনতে পাই ? তাহার কারণ তাঁহারা ভাবুক, তাঁহারা পূজক নহেন। তাঁহারা যতক্ষণ ভাবুকের দৃষ্টিতে কোন মূর্তিকে দেখিতেছেন, ততক্ষণ তাঁহারা চরম করিয়া দেখিতেছেন না। একজন খ্রীষ্টানও তাহার কাব্যে সরস্বতীর বন্দনা করিতে পারেন, কারণ সরস্বতী তাঁহার কাছে ভাবের প্রকাশ-মাত্র। গ্রীসের এলেনীও তাঁহার কাছে যেমন, সরস্বতীও তেমনি। কিন্তু সরস্বতীর যাঁহারা পূজক তাঁহারা এই বিশেষ মূর্তিকে বিশেষভাবে অবলম্বন করিয়াছেন, জ্ঞানস্বরূপ অনন্তের এই একটিমাত্র রূপকেই তাঁহারা চরম করিয়া দেখিতেছেন, তাঁহাদের ধারণাকে তাঁহাদের ভক্তিকে এই বিশেষ রূপের বন্ধন হইতে তাঁহারা মুক্ত করিতে পারেন নাই।

তারপরই তিনি বলেছেন : এই বন্ধন মানুষকে এতদূর পর্যন্ত বন্দী করে যে, শুনা যায় শক্তি উপাসক কোনো একজন বিখ্যাত ভক্ত মহাত্মা

আলিপুর পশুশালার সিংহকে বিশেষ করিয়া দেখিবার জন্য অতিশয় ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কেননা সিংহ মায়ের বাহন। শক্তিকে সিংহরূপে কল্পনা করিতে দোষ নাই--কিন্তু সিংহকেই শক্তিরূপে যদি দেখি তবে কল্পনার মহত্ত্বই চলিয়া যায়। যে কল্পনা সিংহকে শক্তির প্রতিরূপ করিয়া দেখায় সেই কল্পনা সিংহে আসিয়া শেষ হয় না বলিয়াই আমরা তাহার রূপ উদ্ভাবনকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি—যদি তাহা কোনো এক জায়গায় আসিয়া বদ্ধ হয় তবে তাহা মিথ্যা, তবে তাহা মানুষের শত্রু।

কবির এই বক্তব্য সে যুগে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। কারণ, তিনি যে তাঁর আক্রমণের লক্ষ্যবিন্দু করেছিলেন শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণকে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তবে তিনি যে ভাষায় রামকৃষ্ণকে 'শক্তি উপাসক' আখ্যা দেন, তাতে কিছু সংকীর্ণতাই যেন প্রকট হয়ে পড়ে। পরমহংসদেব সাকার ও নিরাকার সাধনায় সিদ্ধ, সিদ্ধ বিভিন্ন ধর্মমতের সাধনায় এটা সুপরিজ্ঞাত সত্য। রামকৃষ্ণ সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রতীক এবং 'যত মত তত পথে'র প্রবক্তা। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ যদি নিজেকে অনন্তস্বরূপ নিরাকারের সাধক হিসেবে সপ্রমাণ করতে অগ্রসর হয়েও থাকেন, তাহলেও তিনি সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট হবেন। কবি নিজেই একটি বিশেষ গোত্রের প্রতিনিধিত্ব করছেন, এমন কথা ভাবা কষ্টকর। কবির এই বক্তব্য সে যুগে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল এবং নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র এ প্রসঙ্গে যে মতামত উপস্থাপিত করেছিলেন, সেটা আমরা পরে আলোচনা করব।

প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯০১ সালের ২২শে ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৫ সালের ১৯শে জানুয়ারী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তিরোধান ঘটে (বাংলা সন ১৩১১)। সে সময় রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃত্বভার বহন করে চলেছেন এবং স্বীয় সমাজের ধর্মমত প্রতিষ্ঠায় দারুণভাবে উদ্যোগী। যে সময় তিনি 'রূপ ও অরূপ' প্রবন্ধ লেখেন, তারই কাছাকাছি সময়ে

(১৯১০ সালে) এগারোই মাঘ ব্রাহ্মসমাজে 'বিশ্ববোধ' প্রবন্ধ পাঠ করেন।

অন্য প্রসঙ্গে মনোনিবেশ করার আগে আমরা রামকৃষ্ণদেবের সিংহ দর্শন প্রসঙ্গটি স্মরণ করতে পারি। শ্রীম কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'-এর চতুর্থ ভাগ একাদশ খণ্ড প্রথম পরিচ্ছেদে উক্ত ঘটনার উল্লেখ পাই। মণিলাল মল্লিককে ঠাকুর উপদেশ দিচ্ছিলেন। সেদিন ছিল ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৪ (বাংলা ১৩ই ফাল্গুন, ১২৯০)। মণিলাল মল্লিক ঠাকুরকে বলছেন, আপনার অসুখ,—তা না হলে আপনি একবার গিয়ে দেখে আসতেন গড়ের মাঠের প্রদর্শনী। শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারমশাই প্রমুখ উপস্থিত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বলছেন, আমি গেলে সব দেখতে পাব না! একটা কিছু দেখেই বেহুঁশ হয়ে যাবো—আর কিছু দেখা হবে না। চিড়িয়াখানা দেখাতে লয়ে গিয়েছিল। সিংহ দর্শন করেই আমি সমাধিস্থ হয়ে গেলাম!—ঈশ্বরীর বাহনকে দেখে ঈশ্বরের উদ্দীপন হলো—তখন আর অন্য জানোয়ার কে দেখে! সিংহ দেখেই ফিরে এলাম।

উপরোক্ত ঘটনাটাকেই রবীন্দ্রনাথ বিদ্রূপাত্মক ভাষায় উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে যে, 'সঞ্চয়' গ্রন্থে সংযোজিত এবং সমসাময়িক কালে রচিত রবীন্দ্রনাথের আরও কিছু প্রবন্ধে 'মূর্তিপূজা বিরোধী' মনোভাবের পরিচয় পাই। 'ধর্মের নবযুগ' (১৩১৮) প্রবন্ধে তিনি রামমোহন রায়ের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে ঘোরতর আক্রমণ চালান। উক্ত প্রবন্ধে তিনি বলেছেন: তিনি (রামমোহন) মূর্তিপূজার মধ্যেই জন্মিয়াছিলেন এবং তাহারই মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু এই বহুকালব্যাপী সংস্কার ও দেশব্যাপী অভ্যাসের নিবিড়তার মধ্যে থাকিয়াও এই বিপুল এবং প্রবল এবং প্রাচীন সমাজের মধ্যে কেবল একলা রামমোহন মূর্তিপূজাকে কোনোমতেই স্বীকার করিতে পারিলেন না। তাহার কারণ এই, তিনি আপনার হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বমানবের হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মূর্তিপূজা সেই অবস্থারই পূজা—যে অবস্থায়

মানুষ বিশেষ দেশকে বিশেষ জাতিকে বিশেষ বিধিনিষেধ সকলকে বিশ্বের সহিত অত্যন্ত পৃথক করিয়া দেখে যখন সে বলে যাহাতে আমারই বিশেষ দীক্ষা তাহাতে আমারই বিশেষ মঙ্গল। যখন সে বলে আমার এই সমস্ত বিশেষ শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে বাহিরের আর কাহারও প্রবেশ করিয়া ফল নাই এবং প্রবেশ করিতে দিবই না। ···· বস্তুত মূর্তিপূজা সেইরূপ সেকালেরই পূজা যখন মানুষ বিশ্বের পরম দেবতাকে একটি কোনো বিশেষ রূপে একটি কোনো বিশেষ স্থানে আবদ্ধ করিয়া তাহাকেই বিশেষ মহাপুণ্যফলের আকর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে, অথচ সেই মহাশূন্যের দ্বারকে সমস্ত মানুষের কাছে উন্মুক্ত করে নাই ··মূর্তিপূজা সেই সময়েরই, যখন পাঁচ সাত ক্রোশ দূরের লোক বিদেশী, পরদেশের লোক ম্লেচ্ছ, পরসমাজের লোক অশুচি এবং নিজের দলের লোক ছাড়া আর সকলেই অনধিকারী — এক কথায় যখন ধর্ম আপন ঈশ্বরকে সংকুচিত করিয়াছে ··।

রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য প্রকৃতপক্ষে মূর্তিপূজার স্বরূপ ও মৌল ধারণাকে বর্জন করে লৌকিক ধারণাকেই গুরুত্ব দিয়ে অযৌক্তিক ও অনৈতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে আক্রমণে উদ্যত হয়েছে। মূর্তিপূজা যে "ঈশ্বরকে সংকুচিত করিয়া সমস্ত মানুষকে সংকুচিত" করে না সেটা রামকৃষ্ণদেব স্বীয় জীবনেই প্রমাণ করেছেন এবং সমগ্র বিশ্বকে একাসনে প্রতিষ্ঠিত করার উপায়স্বরূপ পথও দেখিয়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সাকার ও নিরাকার তত্ত্বের সামগ্রিক ভূমিকে অগ্রাহ্য করেই মূর্তিপূজাকে আক্রমণ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি একটি বিশেষ লক্ষ্য সামনে রেখেই এ কাজ করেছেন। ব্রাহ্মসমাজে ভাঙন, ব্রাহ্মচেতনা নিয়ে বিভ্রান্তি ইত্যাদি হতাশাজনক পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথকে কিছু কিছু চোখাবাণ ছাড়তে হয়েছিল। শুধু মূর্তিপূজাকে আক্রমণ নয়, ব্রাহ্মধর্মের হয়ে তাঁকে একই সঙ্গে সওয়াল করতেও হয়।

এবার আমরা সূত্র অনুসরণ করে কুমুদবন্ধু সেন — গিরিশচন্দ্র প্রসঙ্গে ফিরে যাই। রূপ ও অরূপের বিষয় উল্লেখ করে কুমুদবন্ধু সেন

বললেন : প্রবাসীতে রবিবাবুর "রূপ ও অরূপ" নামে একটি প্রবন্ধ পড়লাম। কিন্তু তিনি পরমহংসদেবের নাম স্পষ্টতঃ না করলেও একরকম উল্লেখ করেছেন, আর ভাব-হিসেবে তাঁকে কিছু আক্রমণ ও কটাক্ষ করেছেন।

কুমুদবন্ধুবাবুর এই বক্তব্য শুনে গিরিশচন্দ্র বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন : রবিবাবু ঠাকুরকে আক্রমণ করেছেন? কেন?

গিরিশচন্দ্রের সবিস্ময় প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসেন "রূপ ও অরূপ" প্রবন্ধের বিষয়বস্তু বিন্যস্ত করে ভাবগত দিকটি বোঝাতে উদ্যোগী হন। বলেন : তিনি (রবীন্দ্রনাথ) বলেছেন, বিদেশী ভাবুকেরা প্রতিমা পূজার সম্বন্ধে যে ভাবের কথা বলে থাকেন তাঁরা ভাবুক, তাঁরা পূজক নন। তাঁরা যতক্ষণ ভাবুকের দৃষ্টিতে কোন মূর্তিকে দেখছেন ততক্ষণ তাঁরা চরম করে দেখেন না। কিন্তু যাঁরা পূজক তাঁরা বিশেষ মূর্তিকে বিশেষ ভাবে অবলম্বন করেছেন। জ্ঞানস্বরূপ অনন্তের এই একটি মাত্র রূপকেই চরম করে দেখছেন। তাঁদের ধারণাকে তাঁদের ভক্তিকে বিশেষ রূপের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেন না।

সেখানে উপস্থিত ডাক্তার কাঞ্জিলাল শ্রীসেনকে আবার প্রশ্ন করেন : কিন্তু ঠাকুরের কথা রবিবাবু কি বলেছেন?

কুমুদবন্ধুবাবু এই প্রশ্নের জবাবে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বুঝিয়ে বলতে সচেষ্ট হন, বলেন : তিনি (রবীন্দ্রনাথ) বলেছেন যে, এই রূপের বন্ধন মানুষকে এতদূর পর্যন্ত বন্দী করে তার দৃষ্টান্তরূপ তিনি লিখেছেন যে, তিনি শুনেছেন, শক্তিউপাসক কোন এক জন বিখ্যাত ভক্ত মহাত্মা আলিপুর পশুশালার সিংহকে বিশেষ করে দেখবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছিলেন কেননা 'সিংহ মায়ের বাহন'। রবিবাবু বলেন যে, শক্তিকে সিংহরূপে কল্পনা করতে দোষ নেই কিন্তু সিংহকেই শক্তিরূপে দেখলে কল্পনার মহত্ত্বই চলে যায়। কেননা, যে কল্পনা সিংহকে শক্তির প্রতিরূপ দেখায়, সেই কল্পনা সিংহে শেষ হয় না বলে তার রূপ উদ্ভাবনকে সত্যি বলে গ্রহণ করা যায়—যদি তা কোন এক জায়গায় এসে বদ্ধ হয়, তবে তা মিথ্যে— মানুষের শত্রু।

এই ব্যাখ্যা শুনে গিরিশবাবু শ্রীসেনকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন : এখানে সিঙ্গিকে (সিংহ) শক্তিরূপে দেখা হল কোথায় ? শ্রীসেন বললেন : ঐ যে পরমহংসদেব বলেছিলেন সিংহ মায়ের বাহন।

গিরিশবাবু এবার জানতে চান : এর মানে কি সিঙ্গি সেই মহাশক্তির রূপ ? তুমি যে বললে রবিবাবু বলেছেন যে, শক্তিকে সিঙ্গিরূপে কল্পনা করতে দোষ নেই, কিন্তু সিঙ্গিকেই শক্তিরূপে দেখলে কল্পনার মহত্ত্ব চলেই যায়।— এটা যে কি তা তিনি বোধহয় নিজেই ভাল করে প্রকাশ করতে পারেননি। তাঁর বলবার উদ্দেশ্য কি সিঙ্গিকে শক্তির প্রতীক বলে কল্পনা করতে পারি, কিন্তু সিঙ্গিই শক্তির রূপ এ কল্পনা করলেই দোষ ? এর মানে কি ? সিংহ মায়ের বাহন এর ভিতর ভাব কি সম্বন্ধ ? কোনও হিন্দু কি কখনও সিংহকেই স্বয়ং মহাশক্তি বলে কল্পনা করে থাকে ? পূজা করা তো দূরের কথা।

এবার অধ্যাপক সেন বলেন : রবিবাবু প্রতিমার পূজাকেই দোষ দিচ্ছেন—মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির পরম শত্রু মনে করছেন এবং পূজাকে ভাবের কল্পনা বলে স্বীকার করতে চান না।

এসময় ডাক্তার কাঞ্জিলাল আবার প্রশ্ন করেন : কেন ? বলেন, সাধকদের হিতের জন্য তো ব্রহ্মরূপ কল্পনা হয়েছে ! তখন কুমুদবন্ধু-বাবু আলোচনার সূত্র গ্রথিত করেন : রবিবাবু বলেন যে, সত্যকে, সুন্দরকে, মঙ্গলকে যে রূপ যে সৃষ্টি ব্যক্ত করতে থাকে—তা বদ্ধ রূপ নয়—তা প্রবাহশীল তা বহু। কিন্তু সত্যসুন্দর মঙ্গলের প্রকাশকে যখন কোন লোক বিশেষ দেশকালপাত্রে বিশেষ আকারে বা আচারে বদ্ধ করতে যায়, তখনি তা সত্যসুন্দর মঙ্গলকে বাধাপ্রাপ্ত করে,—তখনই সে অবনতির পথে যায়।

রবীন্দ্রভাবনার এই ব্যাখ্যা সম্ভবত গিরিশচন্দ্রকে তৃপ্ত করতে পারে নি বরং এটা খণ্ডিত ভাবনা বলেই তাঁর মনে হয়েছে। তাই গিরিশচন্দ্র পরিপূর্ণ করেন, বলেন : হিন্দুও তাই বিগ্রহের রূপকে নিত্য নিত্য রূপ বলে মনে করে—কেননা তা সত্য সুন্দর মঙ্গলকে

ব্যক্ত করতে থাকে তা বদ্ধরূপ নয়—তা একরূপ নয়—অনন্তের অনন্তরূপ। শুধু রূপকে তো একটা জড়রূপ বলে পূজা করা হয় না সেই রূপের ভেতর অরূপেরই পূজা হয়। মৃন্ময় প্রস্তর কিংবা ধাতু-নির্মিত বিগ্রহকে সেবক চিন্ময়ভাবে গ্রহণ করে। পূজা তো কল্পনা ছাড়া নয়। তা তো প্রবাহশীল—তার শক্তি নানামুখী। ভাবগ্রাহী জনার্দন, এটা তো সবাই জানে। ভাব ছাড়া পূজা কোথায়? ভাব দিয়ে কল্পনা দিয়ে পূজো হয়। শুধু জড়রূপ জড়বস্তু আর চর্মচক্ষুর সম্বন্ধ নয়।

গিরিশচন্দ্রের বক্তব্য শোনার পর কুমুদবন্ধু সেন বললেন: রবিবাবু তা স্বীকার করতে চান না। তিনি বলেন যে শিক্ষিত লোক যখন প্রতিমা পূজাকে সমর্থন করেন তখন তিনি বলে থাকেন, প্রতিমা জিনিসটা আর কিছু নয়, ভাবকে রূপ দেওয়া। মানুষের ভিতর যে বৃত্তি শিল্প সাহিত্যের সৃষ্টি করে প্রতিমা পূজাও তেমন যেন একটা বৃত্তির কাজ।

গিরিশবাবু কবির বক্তব্য সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্যই যেন প্রশ্ন করেন: কি বলছো? রবিবাবু কি লিখেছেন? জবাবে কুমুদবন্ধু সেন বললেন: তিনি তাঁর "রূপ ও অরূপে" বলেছেন যে, দেবমূর্তিকে উপাসক কখনও সাহিত্য হিসেবে দেখেন না। রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য কুমুদবন্ধুবাবুর বয়ানে শুনে গিরিশচন্দ্র কিছুটা নির্লিপ্ত-ভাবেই জানালেন: এটা সবাই জানে এ কাউকে বলে দিতে হয় না। কিন্তু ভাবকে রূপ দেওয়া কিনা বলছিলে?

অধ্যাপক সেন এবার আরেকটু স্পষ্ট করেই বলেন: রবিবাবু তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন যে প্রতিমা ভাবকে রূপ দেওয়া নয়। তিনি দেবমূর্তি কল্পনা আর সাহিত্যের কল্পনা এক নয় বলেছেন। কেননা কল্পনাকে মুক্তি দেবার জন্য সাহিত্যে রূপের সৃষ্টি আর দেবমূর্তি কল্পনাকে বদ্ধ করবার জন্য। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বুঝিয়ে বলার জন্য কুমুদবন্ধু সেন আরও বলেন: তিনি বলেন কল্পনাকে তখনই কল্পনা বলে জানা যায় যখন তার প্রবাহ থাকে—যখন তার গতি থাকে

যখন তার সীমা ঠিক থাকে না—তখনি কল্পনা সত্যি কাজ করে। সেই কাজ রবিবাবু বলেন—সত্যের অনন্ত রূপকে নির্দেশ করা।

এবার গিরিশবাবু বললেন : এটা ঠিক হয় না। কিন্তু কল্পনা—কল্পনা। সাহিত্যে শিল্পে যে কল্পনা সত্যশিবসুন্দরকে নির্দেশ করে দেবপূজাও সেই কল্পনার অনুগামী হয়ে তার ইষ্টচিন্তা করে, সেই সত্য শিব মঙ্গলের ধ্যান করে। পূজার মন্ত্র অনুষ্ঠানপদ্ধতি কি শুধু জড়-বস্তুকে নির্দেশ করে? এই সর্বব্যাপী মহাশক্তির উদ্বোধন করে না? আবাহন 'প্রাণ-প্রতিষ্ঠা' তবে কি?

অধ্যাপক সেন কবির বক্তব্যকে আবার স্পষ্ট করে উপস্থাপিত করার জন্য বললেন : কিন্তু কল্পনা যখন থেমে গিয়ে কেবলমাত্র একটা রূপেই একান্তভাবে আবদ্ধ থাকে তখন আর রূপের অনন্ত সত্যকে দেখায় না—রবিবাবু তাই বলেছেন। প্রত্যুত্তরে গিরিশচন্দ্র প্রশ্ন করেন : কিন্তু কল্পনা থামে কোথায়? হিন্দুর প্রতিমা পূজায় যে রূপকে ভাব দেওয়া হয়নি আর কল্পনায় যে সত্যের অনন্ত রূপকে নির্দেশ করে না—তা তিনি জানলেন কি করে? হিন্দুর দেবমূর্তির রূপ যে সত্যসুন্দর শিবকে ব্যক্ত করবার উদ্দেশ্যে নয় তা তিনি জানলেন কি করে? সে সাধনা কি তিনি করে দেখেছেন? আর তিনি একজন এত বড় কবি, তিনি জানেন না ভাবে রূপ ফুটে ওঠে? ভাব তাতো একান্তভাবে কোথাও বদ্ধ হতে পারে না।

কুমুদবন্ধুবাবু যেন গিরিশবাবুর বক্তব্যকেই সরলতর করার প্রয়াসে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে টেনে নিয়ে এলেন, বললেন : রবিবাবু তাঁর "রূপ ও অরূপ" প্রবন্ধেই স্বীকার করেছেন, সাহিত্য শিল্পকলার ভাব রূপে ধরা দেয় বটে, কিন্তু রূপে বদ্ধ হয় না; তাতে নবনব রূপের প্রবাহ সৃষ্টি করতে থাকে। তাই প্রতিভাকে "নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি" বলা হয়। প্রতিভা রূপের ভিতর বন্দী থাকে না—তার কাজ শুধু রূপের মধ্যে চিত্তকে ব্যক্ত করা। এই জন্য প্রতিভার নব নব উন্মেষের শক্তি থাকা চাই। কবির বক্তব্যকে অনুসরণ করেই গিরিশচন্দ্র যোগ করেন : যে কোন সাধক—প্রতিমা পূজক সাধকের

সাধন কাহিনী আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়, সাধকের পূজা রূপ দিয়ে সাধকের চিত্তকে বিকাশ করে, নিত্য নূতনভাবে নূতন কল্পনার প্রবাহে।···কল্পনা ছাড়া কি পূজা কখনও করা যায়? মানসপূজাটা কি? মানস ধ্যান কি? ভাব ছাড়া কি ভাবময়কে ভাবা যায়? রবিবাবুর মত ভাবুক কবি যে রূপে অরূপের সন্ধান পান না, ব্যক্তের ভিতর অব্যক্তের আভাস দেখতে পান না এটাই বেশী আশ্চর্য।

তারপরই গিরিশচন্দ্র কিছুটা ব্যথিতচিত্তে বলেন : ঠাকুরের সাধনার উপর, ভাবের উপর, রবিবাবুর এই নিরর্থক কটাক্ষ একেবারে হাওয়ার উপর তাঁর কবিকল্পনা। যিনি জগতের প্রত্যেক পদার্থকে সেই ব্রহ্মবস্তু—মহাশক্তির বিকাশ দেখতেন, মহাভাবে সমাধিস্থ থাকতেন, শ্যামল তৃণরাশি পদদলিত দেখলে যিনি নিজের দেহে বেদনা বোধ করতেন, কোনও মূর্তি, কোনও মন্দির সৃষ্টির যে কোন স্থানে শক্তির ভাবের বিশেষ দেখলে, যিনি তৎক্ষণাৎ অরূপের ভাব-সাগরে ডুবে যেতেন, ব্রহ্মভক্তরাও যাঁকে একাধারে শাক্ত, বৈষ্ণব বৈদান্তিক যোগী বলে নির্দেশ করেন, তাঁকে শুধু শক্তির উপাসক ভক্ত বলে উল্লেখ করা উদারতার পরিচায়ক হয়নি।

স্বীয় আবেগে গিরিশচন্দ্র বলতে থাকেন : কেশববাবুর মত মহাপুরুষ নিরাকার সাধকও যাঁর অসাম্প্রদায়িক ভাব দেখে অনুসরণ করে নিজের ভাবে মিশিয়ে নব-বিধান প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তাঁকে একজন শাক্ত ভক্ত মাত্র বলা সমীচীন হয়নি। কবিত্বের অনুভূতি আর ব্রহ্মানুভূতি এক নয়। কিন্তু তিনি যে পরমহংসদেবের উপর মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তাও সম্পূর্ণ ভুল। তিনি (পরমহংসদেব) শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে বলেছিলেন, মায়ের বাহন দেখলাম, আর কি দেখবো? তার অর্থ কি রবিবাবু এমন নিজের মনগড়াভাবে গ্রহণ করতে পারেন? তাঁকে পশুশালায় নিয়ে গিয়েছিলেন, তাতে সিঙ্গিকে দেখে বলেছিলেন—মায়ের বাহন পশুরাজ দেখলাম—আর কি?

গিরিশচন্দ্র সম্ভবত এ ব্যাপারে কিছুটা ভাবাবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে

উঠেছিলেন। তাই তিনি আলোচনার সূত্র অনুসরণ করে বলতে থাকেন : যেমন সূর্যের আলো দেখলে জোনাকির আলো কে দেখতে চায়—ঠাকুর সেইভাবে অন্য পশু দেখতে যাননি। যিনি নিখিল পরিদৃশ্যমান জগতের সর্ব বস্তুতে বিশেষ বিশেষ শক্তি প্রকাশে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখতেন, সেইভাবে যিনি "সর্ব খল্বিদং ব্রহ্ম" দর্শন করতেন, তাঁর সেই অনুভূতির দোষ দেখানো, যিনি যতবড় সাহিত্যিক হন না কেন, তা তাঁর অনাধিকার চর্চা।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি গিরিশচন্দ্রকে ব্যথিত করেছিল, ক্ষুব্ধও করেছিল। পরিস্থিতি বুঝেই কুমুদবন্ধুবাবু যোগ করেন : কিন্তু বিচার করতে দোষ কি? বিচার করার প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র বললেন : বিচার করতে হলে প্রথমে জীবন আগাগোড়া আলোচনা করতে হয়। তাঁর কিছু জানলাম না আর মাঝখান থেকে একটা কথা টেনে নিয়ে বিকৃত ব্যাখ্যা করাকে সত্যানুসন্ধিৎসা বলে না। আর তিনি যখন কবি, তিনি তো নিজে প্রত্যহ এই প্রকৃতির ভিতর রূপের পূজা করে থাকেন, শিবের রূপে প্রকৃতির রূপ গড়ে কবিতা রচনা, তা কি রূপের পূজা নয়? অধিকারভেদে কেহ ক্ষুদ্র রূপে তন্ময়, কেহ বিরাট রূপে তন্ময়। কিন্তু অরূপ আলোয় যেতে গেলে সেই রূপের ভিতর দিয়ে সেই রূপের পূজা করে অরূপকে খুঁজতে হবে—সেই রূপ দিয়ে অরূপকে পেতে হবে।

এবার আমরা দেখার চেষ্টা করব যে, রবীন্দ্রনাথ সত্যিই কি মনে-প্রাণে রূপকে বর্জন করে অরূপের সাধনায় আত্মস্থ ছিলেন। আমরা যদি ১৮৯৫ সাল থেকে ১৯০৫ সালের রবীন্দ্রনাথকে দেখি তাহলে কোন অবস্থাতেই তাঁকে অপৌত্তলিক মনে হবে না।

কবি নবীনচন্দ্র সেন তখন রাণাঘাটের মহকুমা শাসক। সময়টা হচ্ছে ১৮৯৩ সাল। রবীন্দ্রনাথ জমিদারীর কাজে কুষ্টিয়া যাওয়ার পথে নবীনচন্দ্রের আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গটি নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন' গ্রন্থের "বন্ধুসমাগম" শীর্ষক অধ্যায়ে বিস্তৃত-ভাবে উল্লিখিত হয়েছে। সেদিন রাণাঘাটে রবীন্দ্রনাথ "এস এস

ফিরে এস ! বধূ হে ফিরে এস" গানটি শোনান। এ প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্র সেন বলেছেন : আমার বোধ হইতে লাগিল, কণ্ঠ একেবারে গৃহপূর্ণ করিয়া, গৃহের ছাদ ভেদ করিয়া আকাশ মুখরিত করিতেছে।···গানের করুণ ভক্তিরসে যেন তাঁহার অধর হইতে গোমুখী-নিঃসৃত জাহ্নবীর পবিত্র ধারার মত প্রবাহিত হইতেছে। আমি তখন "রৈবতক" "কুরুক্ষেত্রের" কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর। গীত শুনিতে শুনিতে আমি আত্মহারা হইলাম। আমার কঠোর হৃদয়ও গলিল ; আমার নেত্র ছল ছল করিতে লাগিল। আমি—পৌত্তলিকের এ ভাব দেখিয়া রবিবাবু কি মনে করিবেন ভাবিয়া আমি অশ্রু সম্বরণ করিয়া তাঁহাকে এ গানের জন্য অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। তারপর নিজের রচিত আরও দুইটি গীত গাহিলেন। বঙ্কিমবাবুর "বন্দে মাতরম" গাইতে বলিলে, কেবল প্রথম পদটি মাত্র গাহিলেন। বলিলেন, গানটি তাঁহার মুখস্থ নাই।···রাধাকৃষ্ণের লীলা সম্বলিত রবিবাবুর অনেক সুন্দর সুন্দর গান আছে। বিশেষতঃ উপরের কীর্তনটি লক্ষ্য করিয়া রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "আমি অনেক সময়ে ভাবি, আমিও পৌত্তলিক কি না। বিশেষতঃ ভাগবত সম্বন্ধে অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের হইতে আমার ধারণা স্বতন্ত্র। আমি ভাগবতখানিকে একটি খুব উচ্চ অঙ্গের রূপক মনে করি।"

আমি (নবীনচন্দ্র) বলিলাম : "উহা রূপক মনে করিয়া যদি আপনার তৃপ্তি হয়, ক্ষতি নাই। আপনি সেইভাবে দেখুন। কিন্তু আমি যে যাত্রার গানে কৃষ্ণ সাজিয়া আসিলে দেখিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারি না, আমার সেই কালো পুতুলটি ভাঙ্গিবেন না। আমার জন্য উহা রাখিয়া দিউন।" বলিতে বলিতে আমার চক্ষু সজল হইল। দেখিলাম, আমার প্রাণের এ উচ্ছ্বাস তাঁহার প্রাণও স্পর্শ করিল। তাঁহার চক্ষুও ছল ছল হইয়া উঠিল।

উল্লিখিত ঘটনাটিকে আমরা কোন অবস্থাতেই বিচ্ছিন্ন কোন ব্যাপার বলে তুচ্ছ করতে পারি না এবং এই ঘটনার মাধ্যমে রবীন্দ্র-নাথের একটা রূপ স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। আসলে মূর্তি বা প্রতীক

কল্পনা কবি-কল্পনার সঙ্গে বিশেষ কোন পার্থক্য সৃষ্টি করে কি? 'সাহিত্য' গ্রন্থের "সৌন্দর্যবোধ" নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যখন সরস্বতীর অপরূপ রূপ কল্পনা করেন, তখনও তিনি কি সৌন্দর্য সঞ্জাত এক প্রতিমার পূজারী নন? তিনি বলেছেন, আধুনিক কবি বলিয়াছেন: ট্রুথ ইজ বিউটি, বিউটি ইজ ট্রুথ। আমাদের শুভ্রবসনা কমলালয়া দেবী সরস্বতী একাধারে ট্রুথ এবং বিউটি মূর্তিমতী। রবীন্দ্রনাথ এখানেও একটি মূর্তি কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন।

'ধর্ম' গ্রন্থের "ততঃ কিম্" শীর্ষক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ এবং বর্জন, বন্ধন এবং বৈরাগ্যের এক সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন, বলেছেন, এই দুটাই সমান সত্য—একের মধ্যেই অন্যটির বাসা, কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া সত্য নহে। দুইকে যথার্থরূপে মিলাইতে পারিলেই তবে পূর্ণতা লাভ করিতে পারা যায়। শংকর ত্যাগের এবং অন্নপূর্ণা ভোগের মূর্তি—উভয়ে মিলিয়া যখন একাঙ্গ হইয়া যায়, তখনই সম্পূর্ণতার আনন্দ। আমাদের জীবনে যেখানেই এই শিব ও শিবানীর বিচ্ছেদ, যেখানেই বন্ধন ও মুক্তির একত্রে প্রতিষ্ঠা নাই, যেখানেই অনুরাগ ও বৈরাগ্যের বিরোধ ঘটিয়াছে সেইখানেই যত অশান্তি, যত নিরানন্দ। রবীন্দ্রনাথ এখানেও অনির্বচনীয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব বোঝাতে বা অরূপের কল্পনা করতে মূর্তির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। আসলে মূর্তি কল্পনার যে আদি উৎস, সেখানে কল্পনাই প্রধান। ফলে রবীন্দ্রনাথও এর প্রভাব থেকে মুক্ত নন।

তবু তিনি "পৌত্তলিকতার" বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার নামে এমনভাবে মূর্তিপূজা বিদ্বেষী হয়ে উঠলেন কেন? কেন তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়ের আদর্শকে আড়াল করে শুধু তাকে শক্তিসাধক বলে চিহ্নিত করলেন? ঐতিহাসিক পটভূমিকায় এই বিষয়টিকে বোঝা প্রয়োজন।

আমরা 'সঞ্চয়' নামক গ্রন্থের "ধর্ম শিক্ষা" শিরোনামে আলোচিত বিষয়টির দিকে দৃষ্টি ফেরাতে পারি। উক্ত আলোচনাসূত্রে রবীন্দ্রনাথ

বলেছেন : ব্রাহ্মসমাজে মানুষের মনকে নানা দিক দিয়া আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া ধরিবার বাঁধা পদ্ধতি নাই। তাই আমরা কেবলই আক্ষেপ করিয়া থাকি ছেলেদের মন যে আলগা হইয়া খসিয়া খসিয়া যাইতেছে। তথাপি এ প্রকার অনির্দিষ্টতার যে অসুবিধা আছে, তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে কিন্তু সাম্প্রদায়িক অতি-নির্দিষ্টতার যে সাংঘাতিক অকল্যাণ তাহা স্বীকার করা ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ব্রাহ্মধর্মের ভিতরকার এই অনির্দিষ্টতাকে যথাসম্ভব দূর করিয়া তাহাকে এক জায়গায় চিরন্তন রূপে স্থির রাখিবার জন্য আজকাল ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ ব্রাহ্মধর্মকে একটি ধর্মতত্ত্ব একটি বিশেষ ফিলজফি বলিতে ইচ্ছা করেন। ইহার মধ্যে কতটুকু দ্বৈত, কতটুকু অদ্বৈত, কতটুকু দ্বৈতা-দ্বৈত; ইহার মধ্যে শঙ্করের প্রভাব কতটা, কতটা কান্টের, কতটা হেগেল বা গ্রীনের তাহা একেবারে পাকা করিয়া একটা কোনো বিশেষ তত্ত্বকেই চিরকালের মত ব্রাহ্মধর্ম নাম দিয়া সমাপ্ত করিয়া দিবার জন্য তাঁহারা উদ্যত হইয়াছেন। বস্তুত ব্রাহ্মসমাজের প্রতি যাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই, তাঁহারা অনেকেই এই কথা বলিয়াই ব্রাহ্মধর্মকে নিন্দা করিয়াছেন যে, উহা ধর্মই নহে উহা একটি ফিলজফি মাত্র, ইঁহারা সেই কলঙ্ককেই গৌরব বলিয়া বরণ করিয়া লইতে চাহেন।

কবি উক্ত প্রবন্ধে ব্রাহ্মধর্মকে একটা ধর্মমত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিস্তর তর্কজাল বিস্তার করেছেন ঠিকই, তবুও তিনি ব্রাহ্মসমাজের আভ্যন্তরীণ শূন্যতাকে স্বীকার করতে রাজী হন নি। এটাই ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি। এ প্রসঙ্গে আমরা পরিচয় গ্রন্থে বিধৃত ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা শীর্ষক প্রবন্ধটির কথা স্মরণ করতে পারি। উক্ত প্রবন্ধে তিনি বলেছেন : ভারতবর্ষে সামাজিক মিলন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের রূপ গ্রহণ করিল। ব্রহ্মায় আর্যসমাজের আরম্ভ কাল, বিষ্ণুতে মধ্যাহ্নকাল, এবং শিবে তাহার শেষ পরিণতির রূপ রহিল। ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ মূর্তিপূজার তত্ত্বকে খণ্ডন করেন, আবার দেবমূর্তির সমন্বয়েই ভারতীয় ইতিহাসের ধারাকে বিশ্লেষণ করেন। এটা কি

পরস্পরবিরোধিতা, না পরিপূরক হিসেবে পূর্ণতা—সেটা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

তবে দেবমূর্তির রূপ দেখে রবীন্দ্রনাথও যে অরূপের সন্ধান পেয়েছিলেন, পুতুল-প্রতিমার মধ্যে পেয়েছিলেন মহত্তর ভাব এবং মৃন্ময়ীকেই আবিষ্কার করেছিলেন চিন্ময়ী সত্তায়, তা আমরা একটি ঘটনা থেকেই বুঝতে পারি। ১৮৯৪ সালের ৫ অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবীকে একটি চিঠি লেখেন—যে চিঠিতে তিনি দুর্গাপূজার তাৎপর্য এবং দুর্গাপ্রতিমার মহিমা বর্ণনা করেন। এখানে সেই চিঠি থেকে কয়েকটি লাইন তুলে দিলেই বিষয়টি স্পষ্টতর হয়ে উঠবে।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন: যেটাকে আমরা দূর থেকে শুষ্ক হৃদয়ে সামান্য পুতুল মাত্র দেখেছি, সেইটেই কল্পনায় মণ্ডিত হয়ে পুতুল আকার ত্যাগ করে; তখন তার মধ্যে এমন বিরাট একটা ভাবের এবং প্রাণের সঞ্চার হয় যে, দেশের রসিক-অরসিক সকল লোকই তার সেই অমৃত ধারায় অভিষিক্ত হয়ে ওঠে। ····

হৃদয়ের ভিতর দিয়ে দেখতে পারলে তাদের দেবতা বলে চেনা যায়· তাদের সীমা থাকে না।

রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে চরম সত্যটি উচ্চারণ করেছেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়, বলেছেন: এই কারণে বাংলাদেশের লোক যাকে উপলক্ষ করে, আনন্দে, ভক্তিতে প্লাবিত হয়ে উঠছে, তাকে আমি যদি মাটির পুতুল বলে দেখি, তবে তাতে কেবল আমারই ভাবের অভাব প্রকাশ পাবে।

রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের পর তাঁরই লেখা "রূপ ও অরূপে"র বক্তব্য কি স্ববিরোধী চিন্তার ফসল বলে মনে হয় না? মূর্তি যে নিছক মাটির পুতুল নয়, এর পিছনে যে একটা গভীর ভাব, একটা অরূপচেতনা বর্তমান - সেটাই তো সনাতন ধর্মের বক্তব্য। তাহলে আর রবীন্দ্রনাথ অহেতুক কেন শ্রীরামকৃষ্ণকে বিদ্ধ করেন বিদ্রূপ কটাক্ষে?

গীতার প্রভাব

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতের সমাজ ও ধর্মজীবনে নানা বিরুদ্ধবাদী শক্তির প্রতিকূল ধারা এবং জড়বাদের প্রভাব স্পষ্ট চেহারা ধারণ করেছিল। পাশ্চাত্যের ধর্ম ও বিজ্ঞানের যৌথ প্লাবনের সামনে ভারতীয় সংস্কৃতি, মানসিকতা ও ভাবধারা সংহত মূর্তিতে আত্মপ্রতিষ্ঠায় ছিল জড়তাগ্রস্ত। সে সময় (১৮১৫) রাজা রামমোহন রায় সেই প্লাবনের গ্রাস থেকে মুক্তির পথ ও পন্থা হিসেবেই সম্ভবত "আত্মীয় সমাজের" প্রতিষ্ঠা করেন। আমরা আগেই বলেছি, পরবর্তী কালে জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে স্থাপিত হয় "ব্রাহ্মসমাজ",—যেটা রামমোহন রায়ের আত্মীয় সমাজেরই পরিণতি। প্রায় একই সময়ে বোম্বাইতে প্রতিষ্ঠিত হয় "আর্যসমাজ" (১৮৭৫) এবং "থিয়োজফিক্যাল সোসাইটি"। এই তিনটি ধর্মান্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল বিচারসহ ও বুদ্ধিপ্রসূত সাধনাবলীকে প্রধান অবলম্বন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

এক্ষেত্রে আলোচনার সূত্র অনুসরণ করার প্রয়োজনে আবার উল্লেখ করতে চাই যে, ব্রাহ্মসমাজ ছিল ধর্মক্ষেত্রে একেশ্বরবাদী, মূর্তিপূজা-বিরোধী, গুরুবাদে অবিশ্বাসী ও অবতারবাদবিদ্বেষী। রাজা রামমোহনকে অনুসরণ করে "আদি ব্রাহ্মসমাজ" রূপে চিহ্নিত গোষ্ঠী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে একেশ্বরবাদী উপনিষদকে অবলম্বন করেই নিজেদের ধর্মমতকে গঠন ও সমাজজীবনকে বন্ধনের কাজে অগ্রসর হন। তাঁরা এ কাজে ও উদ্যোগে কতটা সফল হয়েছিলেন এবং নিজেদের অন্তঃসার-শূন্যতার ফলেই কি ভাবে ব্রাহ্মসমাজ ত্রিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে—সে কাহিনীও আগেই আলোচিত হয়েছে।

এ-ক্ষেত্রে শুধু স্মরণীয় যে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগেই আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্ব অর্পিত হয়েছিল মহর্ষির কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথের

ওপর। রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি এবং কবি মানেই দার্শনিক। সেদিক থেকে বিশেষ কোন সংকীর্ণ ধর্মীয় গণ্ডি ও পরিমণ্ডলে আবদ্ধ থাকা তাঁর পক্ষে সঙ্গত ছিল না। তাছাড়া তিনি ছিলেন যথার্থ ভারতপথিক, যাঁর পক্ষে সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের মতই শাশ্বত সনাতন ধারার প্রভাব ও ঐশ্বর্যকে অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না, অস্বীকারও তিনি করেন নি।

তবু আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি যে, ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করার পর থেকে আজন্ম সনাতন ভাবধারা ও বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে লালিত-পালিত রবীন্দ্রনাথ বাহ্যিক আচরণ ও বচনে অতিমাত্রায় উপনিষদমুখী হয়ে পড়েন, অবতারবিরোধী মনোভাব প্রকাশ করেন এবং কথায় ও রচনায় নিরাকার একেশ্বরবাদীও হয়েছিলেন। এসবই কি তিনি পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে হয়েছিলেন, অথবা অন্তরের বিশ্বাসকে সংহত করে হয়েছিলেন তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। তবে তিনি যখন বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণচরিত্র" সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কৃষ্ণকে "অবতার" বলে স্বীকার করেন না, দীনেশচন্দ্রের "রামায়ণী কথা" প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে রামচন্দ্রকেও অবতার বলে মেনে নিতে অনীহা দেখান—তখন যেন মনে হয় ব্রাহ্ম-রবীন্দ্রনাথ অবতার-তত্ত্বকে নস্যাৎ করতে কৃতসংকল্প। আবার সেই রবীন্দ্রনাথই যখন কবি রবীন্দ্রনাথ হিসেবে বলেন : 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ-ধূলার তলে', তখন শুধু ভাবি, নিরাকারবাদী কবি ঈশ্বরের চরণ কল্পনা করেই ক্ষান্ত হন নি, সঙ্গে সঙ্গে সেই "চরণের" ধূলা কল্পনা করতেও অগ্রসর হয়েছেন শুধু নিজের মাথাকে সেখানে নত করার আকাঙ্ক্ষায়। পৌত্তলিকতা-বিরোধী রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সেই কল্পনাকে আশ্রয় করেই রবীন্দ্রনাথ, যে কল্পনায় আমরা প্রকৃতিকে প্রমূর্ত করেছি ধ্যান ও সাধনায় এক একটি মূর্তির অবয়বে।

এই পটভূমিকায় দুটি প্রশ্ন খুব সঙ্গত কারণেই দেখা দেয় : রবীন্দ্রনাথ সত্যিই কি অবতারবাদে অবিশ্বাসী ছিলেন? রবীন্দ্রনাথ কি নিরাকার একেশ্বরবাদী ছিলেন কর্মে ও চিন্তায়? তা যদি ছিলেন,

তাহলে নিজের বুদ্ধি ও চেতনাকে কীভাবে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতে কেন্দ্রস্থ করেন? একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে ভারতবাসীর উদার সহিষ্ণুতার মূলে আছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহান বাণী। গীতামহিমার আলোকে কৃষ্ণমহিমায় ভারতবর্ষ আলোকিত হল, আলোর রশ্মি ছড়িয়ে গেল বিশ্বভুবনে। ন্যায়, সত্য ও ধর্ম সংস্থাপিত হল চিরন্তন সত্য দর্শনের উপর। সকল সংশয় নিরসন করে গীতায় ধ্বনিত হল শ্রীকৃষ্ণের মহা আশ্বাসবাণী :

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥

অর্থাৎ, তুমি ঈশ্বর-নির্ভর হও, তাহলে কোন দুঃখই তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সম্পর্কে গীতায় তিনি শিষ্য ও সখা অর্জুনকে বলেছেন : হে অর্জুন, যখন ধর্মের পতন হয় এবং পাপের প্রাদুর্ভাব ঘটে, তখন আমি জন্ম পরিগ্রহ করি। এইভাবে পাপীদের বিনাশ করতে, সৎ ব্যক্তিদের বাঁচাতে এবং ধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই (৪।৭-৮)। মহাভারতে সকল বেদের সারার্থ সংগৃহীত, আর সমগ্র মহাভারতের সারতত্ত্ব গীতায় বর্তমান। স্মর্তব্য, উপনিষদ-তত্ত্বই গীতায় পত্রপুষ্পে শোভিত ও পরিবর্ধিত। এই প্রসঙ্গে আরেকটি তথ্য অবশ্যই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, গীতা ও ভাগবতে একই তত্ত্ব উপদিষ্ট, উভয় গ্রন্থে একই অবতারের উপদেশ প্রবিবৃত। এই গীতাতেই সর্বপ্রথম অবতারতত্ত্ব সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত।

এই সকল তথ্য ও তত্ত্ব স্মরণে রেখে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন দেখা দেয় : একেশ্বরবাদী কোন ব্যক্তির পক্ষে গীতার মূল ভাবকে গ্রহণ না করে অন্তর-প্রবাহে গীতা-অনুরাগী হওয়া কি সম্ভব? কোন গোঁড়া ব্রাহ্ম কি গীতাকে যুক্তি ও বুদ্ধির আশ্রয়ে বরণ করে নিতে পারেন?

লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, অগ্নিঋষি শংকরাচার্যও বৈদান্তিক বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় ও অদ্বৈতমূল ব্যাখ্যাচেতনার ঋজুতায় গীতাকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন নি। গীতার শাঙ্কর ভাষ্যই প্রাচীনতম প্রাপ্তব্য ভাষ্য এবং ঐ

ভাষ্যের উপজীব্য হলো কেবলাদ্বৈতবাদ। তাছাড়া রামমোহন থেকে গান্ধী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রনাথ—কোন ধর্মনায়ক, চিন্তানায়ক ও মনীষীর পক্ষেই গীতা অনুসরণের অন্তরবাহী পথ থেকে সরে আসা সম্ভব হয় নি। গীতা নিয়ে দেশে ও বিদেশে অসংখ্য টীকা ও ভাষ্য রচিত হয়েছে, প্রচারিত হয়েছে অনেক ব্যাখ্যা। তবু একথা সত্য যে, গীতা মূলত অবতারবাদী। আধুনিক কালে বঙ্কিমচন্দ্র নব ভাবধারায় গীতা আলোচনার সূত্রপাত করেন—সে বিষয়েও সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। এ ব্যাপারে আমরা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বক্তব্য স্মরণ করতে পারি। তিনি বলেছিলেন (চরিত কথা, বঙ্কিমচন্দ্র): বঙ্কিমচন্দ্র যে সময়ে গীতার ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত হন, তখন ইংরাজী শিক্ষিত লোকের মধ্যে উহা বিরলপ্রচার ছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যাহার মূলে, বাংলাদেশে সে জিনিষ অচল থাকে না, তাহা প্রচলিত হয়। এই উক্তির আলোকে এই সত্য অবশ্যই ঐতিহাসিকতার দাবী রাখে যে, বঙ্কিমচন্দ্রই সে যুগে পাশ্চাত্য শিক্ষানুরাগীদের মধ্যে গীতা সম্পর্কে আগ্রহের সঞ্চার করেন এবং তারই প্রভাব লক্ষিত হয় ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ঠাকুর পরিবারের দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-নাথের উপর।

ব্রাহ্মসমাজ ত্রিধা বিভক্ত হওয়ায় আদি ব্রাহ্মসমাজের দুর্গরূপে চিহ্নিত ঠাকুরবাড়িতে গীতাচর্চা ও গীতা অনুশীলন যে কতটা গভীর ও ব্যাপক ছিল সে যুগে সেটা কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমন্বয়েই প্রমাণিত। ১৩১১ সালে রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের আগ্রহে ও উদ্যোগে গীতা অনুবাদ ব্যাখ্যাসহ প্রকাশিত হয়। এই একটি ঘটনার দ্বারা একথা নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হয় না যে, সত্যেন্দ্রনাথ ভক্তির আবেগে গীতা প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন বরং বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তি ও বুদ্ধির আশ্রয়েই তিনি এ কাজে অগ্রসর হন। তবে গীতার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ যদি অনুপস্থিত থাকত, তাহলে নিশ্চয়ই এ কাজে তিনি অগ্রসর হতেন না। তিনি মনে করতেন, "গীতা জ্ঞানমার্গাবলম্বী" এবং তিনি শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার

উপক্রমণিকায় বলেন: গীতা কোন সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে। জ্ঞানী-অজ্ঞান, পণ্ডিত-মূর্খ শ্রেষ্ঠ-কনিষ্ঠ অধিকারী সকলেই—স্ব স্ব বুদ্ধি ও যোগ্যতা অনুসারে তাঁহার অগাধ ভাণ্ডার হইতে আধ্যাত্মিক অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন।

আদি ব্রাহ্ম সমাজের নিকেতন থেকে শুধুই সত্যেন্দ্রনাথ একা গীতা প্রকাশে আগ্রহী হন নি, ১৩২১ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথের "গীতাপাঠ" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ অবশ্য গীতার ঐতিহাসিকতা নিয়ে কোন পর্যালোচনায় অগ্রসর হন নি, তিনি মূলত গীতার দার্শনিক প্রসঙ্গেই নিজেকে নিযুক্ত রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ নিজের অনন্য বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। তিনি বলেন: আমাদের দেশে আমি যে ভাবে দার্শনিক আলোচনা করিয়াছিলাম, সে রকম আমার পূর্বে আর কেহ করেন নাই। (সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ষষ্ঠ খণ্ড)। গীতা সম্পর্কে এবং গীতার দার্শনিক ঐশ্বর্য সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রনাথ যে কতখানি আস্থাশীল ও শ্রদ্ধাবান ছিলেন, তা বোঝা যায় কবি অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে। তিনি লিখেছেন: মোটামুটি বলতে পারি এই যে, Huxley, Mill প্রভৃতির গ্রন্থাবলীর পরিবর্তে গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে সাধন সম্বন্ধে অনেক সার উপদেশ পাওয়া যাইতে পারে।

এই মন্তব্যের পটভূমিকা অবশ্যই স্মরণীয়। সে যুগে ইয়োরোপীয় চিন্তাধারায় শিক্ষিত মানুষের মন ছিল আবৃত এবং ভারতীয় সব কিছুকে বর্জন করে পশ্চিম থেকে ধ্যান-ধারণা আমদানী করার প্রবণতাই ছিল প্রবল। একদিকে খৃষ্টধর্মের প্রাবল্য, অন্য দিকে পাশ্চাত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব। এই দুই ধারাকে চোখের সামনে রেখে দ্বিজেন্দ্রনাথ যখন Huxley বা Mill-কে বর্জন করেন, যখন গীতার দিকে নজর ফেরান, তখন সেটা একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বলেই চিহ্নিত হবে। এটা যে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বা খণ্ডিত কোন প্রভাবের ছায়া নয়, সেটা ঠাকুরবাড়ির আভ্যন্তরীণ চিত্রের সঙ্গে পরিচিতজনই স্বীকার করবেন।

সত্যেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ যখন গীতা চর্চায় আত্মস্থ, তখন দেখি আরেক জন, তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—যিনি গীতার ভাবধারায় পরিপূর্ণ এবং আত্মনিবেদিত। লোকমান্য তিলকের সুবৃহৎ গ্রন্থ "গীতারহস্য"-এর সুন্দর ও সাবলীল অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার মূলে ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সক্রিয় আগ্রহ। অবশ্য কেউ কেউ এমন কথাও বলেন যে, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক বিষয়ের আকর্ষণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তিলকের গীত-অনুবাদের কাজে আগ্রহী ততটা হন নি, যতটা হয়েছিলেন সাহিত্যিক মূল্যের আহ্বানে। তবে এ প্রসঙ্গে একটা সত্য অবশ্যই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ঠাকুরবাড়িতে গীতা-চর্চা ও গীতা-অনুধ্যানের যে ধারা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রবর্তন করেছিলেন, সেই ধারাই নানারূপে নানা মহিমায় বিভিন্ন জনকে মোহিত করেছে। আর তারই ফলে কেউ গীতার ঐতিহাসিকতায় আবিষ্ট হয়েছেন, কেউ মুগ্ধ হয়েছেন দার্শনিকতায়, আবার কেউ সাহিত্যিক মূল্যে হয়েছেন চমৎকৃত।

মোটকথা, ঠাকুরবাড়ির চিন্তাশীল ও সংস্কৃতিবান সন্তানরা গীতা-মাহাত্ম্যকে সপ্রেমে বরণ করে নিয়েছেন। একেশ্বরবাদী দেবেন্দ্রনাথ যেমন অবতারবাদী গীতাকে বর্জন করতে পারেন নি, তেমনি পারেন নি তাঁর সন্তানরা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একই পরিবার থেকে গীতার তিন চারটি সংস্করণ প্রকাশের ঘটনা এক বিরল দৃষ্টান্ত। সম্ভবত একমাত্র দৃষ্টান্ত ব্রাহ্ম-পরিবার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি।

এই পরিবেশ ও পরিমণ্ডলে বিরাট সম্ভাবনা ধারণ করে যে তরুণ কবি চোখ মেলে তাকালেন অন্তরে বাইরে, ঘরে এবং বহির্জগতে, সেই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে গীতার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা কি সম্ভব? নানা সময়ে এবং নানাভাবে তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন, খণ্ডন করেছেন অবতারবাদ, তবুও কি তিনি এসব প্রশ্নে অন্তরে-বাহিরে একাত্ম ছিলেন কোন দিনই? সেই জন্যই রামমোহন যেখানে উপাসনার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, ঠাকুরবাড়ির ক্রিয়াকাণ্ডে সেখানে উপাসনা ও বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড একই সঙ্গে স্থান

পেয়েছে। তাই আমরা দেখতে পাই, রবীন্দ্রনাথের অগ্রজরা ব্রাহ্মধর্মের সংকীর্ণ চেতনাকে অতিক্রম করে অনায়াসেই গীতা-চর্চায় আত্মস্থ হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অগ্রজদের মত গীতা সম্পর্কে বা গীতা 'বিষয়ে স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থ রচনা করেন নি—এই ঘটনা স্মরণে রেখেও একজন মননশীল পাঠক অতি সহজেই লক্ষ্য করবেন যে, রবীন্দ্র-রচনা ও চেতনায় গীতার স্থান অতি ব্যাপক এবং অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ। তাই গীতার মত একটি মহৎ ধর্মগ্রন্থের অনুশীলন করতে গিয়ে তিনি কখনও গীতাকে একটি নিরালম্ব তত্ত্ব হিসেবে দেখার চেষ্টা করেন নি। উপনিষদকে যেমন তিনি বিশেষ একটা দেশ ও কালের পটভূমি ও পরিপ্রেক্ষিতের ওপর স্থাপন করেই দেখেছেন, গীতার ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয় নি। এই প্রসঙ্গে আমরা রবীন্দ্রনাথের 'A Vision of India's History'—প্রবন্ধের বিষয়বস্তু স্মরণ করতে পারি। তিনি উক্ত প্রবন্ধে সপ্রমাণিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন যে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিরোধের কালে এবং ফলেই যেমন উপনিষদ উদ্ভূত, তেমনি গীতার সৃষ্টি। তিনি বলেছেন: Krishna, a Kshatriya, was not only at the head of the Vaishnava cult, but the object of its worship, that in His teachings, as inculcated in the Bhagavad Gita, there are hints of detraction against Vedic Verses, we find a proof that this cult was developed by the Kshatriyas. রবীন্দ্রনাথ গীতাকে বলেছেন, ক্ষত্রিয় রাজর্ষি কর্তৃক উপদিষ্ট। উপনিষদে যেমন একটা বৃহৎ গোষ্ঠীর দার্শনিক চিন্তা ভাবনা প্রতিফলিত, গীতাতে তা নয়। গীতা একজনেরই দার্শনিক চিন্তাধারা, একজন গীতার ধর্মমতের প্রবর্তক—যা আমাদের জীবনে প্রযুক্ত হওয়ার উপযোগী এবং আদর্শস্থানীয়।

রবীন্দ্রনাথ সচেতন ভাবেই মনে করতেন যে, ছান্দোগ্য উপনিষদই গীতার আদি রূপের উৎস। রবীন্দ্রনাথ স্বীয় যুক্তি অনুসারে আমাদের

দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে একটি সত্য প্রতিষ্ঠায় হয়েছিলেন অম্বিষ্ট। তিনি তাঁর 'A vision of India's History' গ্রন্থে বলেছেন: ছান্দোগ্য উপনিষদে গুরু ঘোর আঙ্গিরস তাঁর শিষ্য দেবকীনন্দনকে (কৃষ্ণ) যে সকল উপদেশ দিয়েছিলেন, সেই সকল উপদেশাবলীর ভিত্তিতেই কৃষ্ণের ধর্মমত প্রবর্তিত হয়েছে। তাই দেখা যায় যে, আঙ্গিরসের উপদেশের তাৎপর্য গীতাতে বহুল পরিমাণে রক্ষিত। ছান্দোগ্য উপনিষদের কিছু কিছু বাণী গীতার বাণীতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ছান্দোগ্য উপনিষদের অপিপাস শব্দের ছায়ায় আমরা গীতার নিষ্কাম তত্ত্বের স্বরূপ দেখতে পাই, আবার গীতায় উচ্চারিত জ্ঞানময় যজ্ঞের পূর্বাভাস যেন ছান্দোগ্য উপনিষদে শ্রুত।

হিন্দুমত অনুসারে গীতা হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী। এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্নে মতভেদের শিকার হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ কি নিতান্তই পৌরাণিক চরিত্র, না কি ঐতিহাসিক চরিত্র তা নিয়েও বিস্তর গবেষণা ও চর্চা আমরা লক্ষ্য করি। তবে এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ যুক্তিগ্রাহ্য কোন বক্তব্য আজও অপ্রতিষ্ঠিত। অবশ্য আমাদের এই আলোচ্য বিষয় অনুসরণ করার প্রয়োজনে সেদিকে আপাতত নজর নিবদ্ধ করার প্রয়োজন দেখি না। লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রনাথও গীতা বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে গিয়ে এই ঐতিহাসিকতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত হতে পারেন নি।

গীতোক্ত বাণীর উপদেষ্টা কে? রবীন্দ্রনাথ একজন 'পূর্বতন গুরু' এবং পরবর্তী কালে 'একজন মনস্বীর' কল্পনা করেছেন। কবিচেতনায় গীতার দুই রূপ প্রতিফলিত। গীতার মৌল উদ্দেশ্য কি? এ ব্যাপারেও রবীন্দ্রনাথ যেদিকে দৃষ্টি ফেরাতে চেয়েছেন, সেটা হল: দেশে যখন যুদ্ধ করার প্রয়োজন প্রবল, সে সময় দেশ ও জাতি যুদ্ধ-বিমুখ হয়ে পড়েছিল। তাই, দেশ ও জাতিকে "যুদ্ধে প্রবর্তনা দান এবং প্রাণহননের বিরুদ্ধ মনোভাবকে প্রশমিত করাই" গীতার লক্ষ্য। তবে কি রবীন্দ্র-চেতনা এমন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চায় যে,

সম্রাট অশোকের যুদ্ধত্যাগনীতির ফলে দেশে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, সেই জড়তা ও দুর্বলতা থেকে মুক্তির জন্যই গীতার প্রবোধন? অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ২৬১ সালে সংঘটিত কলিঙ্গ যুদ্ধের পরবর্তী কালেই গীতার জন্ম?

এ সব প্রশ্নে এখনও বিস্তর সংশয় ও প্রভূত মত-পার্থক্যের সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া ঐতিহাসিকরা এ ব্যাপারে বিশেষ একটি মতকেই যুক্তিনিষ্ঠ ও তথ্যভিত্তিক বলে প্রমাণ করতে পারেন নি। সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথের এই একান্ত ভাবেই অনুমান-নির্ভর সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করা হবে কিনা সেটা ভিন্ন প্রশ্ন। আপাতত আমরা শুধু রবীন্দ্র-বক্তব্যকেই অনুসরণ করতে চাই।

এই প্রসঙ্গে আমরা প্রবোধচন্দ্র সেন লিখিত 'ধম্মপদ পরিচয়' গ্রন্থে উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এই চিঠিটিতে রবীন্দ্র-অভিমত স্পষ্ট। তিনি বলেছেন: আমার মনে হয় বৌদ্ধ উপদেশ ভারতবর্ষকে যখন নিষ্ক্রিয় করে তুলেছিল, যখন অহিংসা ধর্মের সাত্ত্বিকতা কেবলমাত্র Negative লক্ষণাক্রান্ত, সুতরাং পূর্ণসত্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল, তখন কোন একজন মনস্বী পূর্বতন গুরুর উপদেশকে কর্মোৎসাহকর ভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। সম্মুখে একটি সাময়িক প্রয়োজন অত্যন্ত উৎকটভাবে থাকাতে ব্যাখ্যাটির মধ্যে উচ্চ ভাবের সঙ্গেও তর্কচাতুরী খানিকটা না মিশে থাকতে পারে নি।

গীতার রচনাকাল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে কবির অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের ছায়া প্রলম্বিত। সত্যেন্দ্রনাথ বলেন: বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের মধ্যবর্তী-খৃষ্টাব্দ কিছুকাল অগ্রপশ্চাৎ উহার জন্ম বলাই সঙ্গত। (শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা, উপক্রমণিকা) গীতা চর্চায় বা গীতার ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় ঠাকুরবাড়ির সন্তানরা যে কতখানি একাগ্র ছিলেন—তা এই সকল ঘটনাতেই প্রমাণিত। রবীন্দ্রনাথ যখন গীতায় তর্কচাতুরী লক্ষ্য করেন, তখনও আমরা বুঝতে পারি যে, গীতাকে অনুশীলন এবং অনুধাবন করার ব্যাপারে তিনি নিষ্ঠাবান।

তিনি দারুণ রকম আন্তরিক। কারণ, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ১২শ অধ্যায়ের ৬-৭ শ্লোকে শিষ্যকে আত্মনির্ভরতা পরিহার করার উপদেশ দিয়ে বলেছেন: স্বতন্ত্র বিচারবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে অন্ধভাবে তাঁর শরণ নিলেই মোক্ষলাভের আশা সুনিশ্চিত। অথচ গীতারই দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলছেন: বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ। কারণ; 'বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি'।

এই প্রসঙ্গে আমরা রবীন্দ্রনাথের 'পারস্যযাত্রী' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারি। কবিগুরু বলছেন: যে বাস্তবের পরে মানুষের স্বাভাবিক মমতা, সে যখন ঝাপসা হয়ে আসে, তখন মমতারও আধার যায় লুপ্ত হয়ে। গীতায় প্রচারিত তত্ত্বোপদেশও এই রকমের উড়োজাহাজ—অর্জুনের কৃপা-কাতর মনকে সে এমন দূরলোকে নিয়ে গেল, সেখান থেকে দেখলে মারেই বা কে, মরেই বা কে, কেই বা আপন, কেই বা পর।

শুধু 'পারস্যযাত্রী' গ্রন্থে নয়, 'ঘরে বাইরে' ও 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে কবি এই ধরনের তত্ত্বের অপপ্রয়োগ দেখিয়েছেন। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে বিমলার আত্মকথায় বলা হয়েছে: গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, আত্মাকে তো কেউ মারতে পারে না! · টাকা হরণ করাও সেরকম একটা কথা। টাকা কার? ওকে কেউ সৃষ্টি করে না, ওকে কেউ সঙ্গে নিয়ে যায় না, ওতো কারুর আত্মার অঙ্গ নয়। 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে স্বদেশীয়ানার নামে মনুষ্যত্বকে বলি দেওয়ার বিরুদ্ধে ইন্দ্রনাথ বলছে: এই যে ধিক্কার এটাই কুরুক্ষেত্রের উপক্রমণিকা! অর্জুনের মনেও ক্ষোভ জেগেছিল—ওই ঘৃণাটাই ঘৃণ্য।

লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, অতিমাত্রায় ব্রাহ্ম হয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন প্রত্যক্ষভাবে গীতায় ব্যাখ্যাত "আত্মার অবিনশ্বরত্ব" তত্ত্বকে কটাক্ষ করেন, তখন তিনি স্ববিরোধিতায় আচ্ছন্ন। কারণ, তিনি নিজেও আত্মাকে 'অজাত' ও 'অমৃত' বলে বর্ণনা করেছেন। আগ্রহী পাঠক কবির 'শান্তি নিকেতন' গ্রন্থের "স্বভাবকে লাভ" ও "আত্মার প্রকাশ" প্রবন্ধে

স্তুতিতে মনোযোগ করলেই এই কথার মর্ম অনুধাবন করবেন। তবু তিনি গীতা সম্পর্কে কটাক্ষ করলেন কেন ?

প্রসঙ্গত স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথ "সংস্কার" গল্পে বলছেন: তখনকার পুলিশ কারও বাড়ীতে গীতা দেখলেই সিডিশনের প্রমাণ পেত। এই উক্তিটি ঐতিহাসিক কারণেই স্মরণীয়। কারণ, স্বাধীনতা-আন্দোলনে যে অগ্নি-শিশু বিপ্লবীদল প্রাণ বিসর্জন দিতে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের জীবনে গীতা ছিল অভ্রান্ত জীবনদর্শন। সেই জন্যই সেকালের ইংরেজ শাসক একই সঙ্গে গীতা ও সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করত। কোন তরুণ-যুবার কাছে গীতা দেখাটা ভীত ইংরেজের কাছে ছিল ভূত দেখার সামিল। রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে আদৌ সুনজরে দেখেন নি এবং সন্ত্রাসবাদীরা যেহেতু আত্মার অবিনশ্বরত্ব তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, সেটাও কবি সুনজরে দেখতে পারেন নি।

শরৎচন্দ্র 'পথের দাবী' লেখার পর বিপ্লবী আন্দোলনে এক নতুন ভাবাবেগের সৃষ্টি হয়, আতংকিত হয় ইংরেজ সরকার। ঠিক কাছাকাছি সময়েই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন বিরোধী 'চার অধ্যায়' উপন্যাস লিখে রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদীদের মনোবল ভাঙার কাজেই প্রেরণা দিয়েছেন। এই পটভূমিকায় তিনি নিজে আত্মাকে অজাত ও অমৃত বলে উল্লেখ করা সত্ত্বেও গীতাকে কটাক্ষ করতে গিয়ে কেন আত্মার অবিনশ্বরত্বকে কটাক্ষ করছেন, তা সহজেই বোধগম্য। আসলে, গীতার প্রতি বিরাগ নয়, সেযুগের বিশেষ একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ করার মানসে এবং ব্যাপক ভাবে ইংরেজ বিরোধিতার মনোভাবকে প্রশ্রয় না দেওয়ার কারণেই রবীন্দ্রনাথ বিশেষ একটি দৃষ্টিকোণ থেকে গীতা সম্পর্কে কটাক্ষ করেন।

আমরা দেখেছি, রবীন্দ্রনাথ গীতায় কিছু কিছু স্ববিরোধিতার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এটা তাঁর "গীতা অনুশীলনে নিষ্ঠারই প্রকাশ"। আবার তিনিই 'স্বদেশ' (ভারতবর্ষের ইতিহাস) গ্রন্থে বলছেন: ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে ঐক্য

স্থাপন করা। ⋯এই ঐক্যবিস্তার ও শৃঙ্খলাস্থাপন কেবল সমাজ-ব্যবস্থায় নহে, ধর্মনীতিতেও দেখি। গীতায় জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের মধ্যে যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য-স্থাপনের চেষ্টা দেখি, তাহা বিশেষরূপে ভারতবর্ষের। আবার কবিগুরু 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' (ইতিহাস) গ্রন্থে দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলছেন: মানুষের সকল চেষ্টাই কোনখানে আসিয়া অবিরোধে মিলিতে পারে, মহাভারত সকল পথের চৌমাথায় সেই চরম লক্ষ্যের আলোকটি জ্বালাইয়া ধরিয়াছে। তাহাই গীতা।

রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন যে, সকল "অবিরোধ" বা "বিরোধের বিপ্লব" মহাভারতের চৌমাথায় চরম লক্ষ্যের আলোকটি জ্বালাইয়া রাখিয়াছে, তখন আমরাও কি তাঁর চোখ দিয়েই ভারতবর্ষের মহান ধারাকে, অবিনশ্বর অস্তিত্বকে প্রত্যক্ষ করি না? আমরাও কি সেই সামগান ও সমন্বয়সূত্র উচ্চারণ করে বলি না: তাহাই গীতা?

এই গীতা যে ভারতীয় জীবনধর্মের প্রতীক সেটাও তিনি বলেছেন। 'ভারতবর্ষ' গ্রন্থের "ভারতবর্ষের ইতিহাস" শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন: এই ঐক্য বিস্তার ও শৃঙ্খলা স্থাপন কেবল সমাজব্যবস্থায় নহে, ধর্ম-নীতিতেও দেখি। গীতায় জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের মধ্যে যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা দেখি তাহা বিশেষরূপে ভারতবর্ষের। য়ুরোপে রিলিজন বলিয়া যে শব্দ আছে ভারতবর্ষীয় ভাষায় তাহার অনুবাদ অসম্ভব; কারণ ভারতবর্ষ ধর্মের মধ্যে মানসিক বিচ্ছেদ ঘটিতে বাধা দিয়াছে—আমাদের বুদ্ধি-বিশ্বাস-আচরণ, আমাদের ইহকাল পরকাল, সমস্ত জড়াইয়াই ধর্ম। ⋯⋯ভারতবর্ষের ধর্ম সমস্ত সমাজেরই ধর্ম, তাহার মূল মাটির ভিতরে এবং মাথা আকাশের মধ্যে; তাহার মূলকে স্বতন্ত্র ও মাথাকে স্বতন্ত্র করিয়া ভারতবর্ষ দেখে নাই। ধর্মকে ভারতবর্ষ দ্যু লোক-ভূলোক ব্যাপী মানবের সমস্ত জীবন-ব্যাপী একটি বৃহৎ বনস্পতিরূপে দেখিয়াছে।

রাজা রামমোহন রায়ের ছিল অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং প্রতিভা, তবে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর উদ্দেশ্য এবং মানসিকতা কতদূর ভারত-স্বার্থের পরিপোষক ছিল সেটা নিয়েও বিপুল সংশয় বর্তমান আজকের ঐতিহাসিকের মনে। আপাতত সেসব প্রসঙ্গ মুলতুবি থাক। তিনি ইহুদী, ইসলাম ও হিন্দুধর্মের সত্যানুসন্ধানে ব্রতী হয়েই একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন, তিনি সম্ভবত উপলব্ধি করেছিলেন যে, সকল ধর্মের সারকথাই হচ্ছে একেশ্বরবাদ। তবে তিনি তাঁর বাস্তববুদ্ধির নিরিখে অনুভব করেছিলেন যে, দেশের ধমনীতে প্রবাহিত মূলধারার সঙ্গে সংযুক্ত না হলে একেশ্বরবাদের ধারণা জনমানসে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে না, সেইজন্যই, প্রয়োজনের খাতিরে তিনি উপনিষদ ও বেদান্তের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। কারণ, ভারতবর্ষে একেশ্বর-বাদের শ্রেষ্ঠ উৎস বৈদিক ধারায় উদ্গত উপনিষদ ও বেদান্ত।

সেই জন্যই তিনি উপনিষদের বাংলা ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন, প্রকাশ করেন 'বেদান্তগ্রন্থ'। সম্ভবত 'বেদান্তগ্রন্থ'ই তাঁর প্রথম বাংলা গ্রন্থ। এসব প্রসঙ্গ বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। এখানে শুধু যোগসূত্র হিসেবেই উল্লিখিত হচ্ছে। আমরা আগেই দেখেছি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধর্মমতের মূলভিত্তি এবং অনুষঙ্গ ছিল বৈদান্তিক উপনিষদ, ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রটি তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনার উদ্বোধন ঘটিয়েছিল।

আগেই বলেছি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পর আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্ব-ভার অর্পিত হয়েছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ওপর। ১৮৮৪ সালে, বাংলা ১২৯১ সনের আশ্বিন মাসে মহর্ষিদেব স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকরূপে নির্বাচন করালেন। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের রচনায় উপনিষদের

শ্লোকের কোন স্পষ্ট উল্লেখ বা আলোচনা উল্লেখযোগ্য ভাবে অনুপস্থিত থাকলেও, সম্পাদক পদে বৃত হওয়ার পর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম হিসেবেই তাঁর আত্মপ্রকাশ। সে সময় "ভারতী" পত্রিকায় (১২৯১ সাল) তিনি রামমোহন রায় সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং সেই প্রবন্ধের মাধ্যমেই "তরুণ কবি" ব্রাহ্মমতের ধর্ম ও বিশ্বাসকে সমর্থন ও প্রচার করেন। যত্নবান পাঠক অনায়াসেই অনুসরণ করে দেখতে পারেন যে, এ সময় থেকেই রবীন্দ্ররচনায় উপনিষদের ছায়া স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথের 'ব্রহ্মমন্ত্র' (১৯০১) এবং 'উপনিষদ ব্রহ্ম' (১৯০১) পুস্তক দুটিতে উপনিষদবর্ণিত ধর্মতত্ত্বেরই আলোচনা দেখা যায়। স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাববাহী স্বামী বিবেকানন্দের প্রখর দীপ্তিতে যখন ভারতবর্ষ আলোকিত এবং বিশ্ব চমকিত, ব্রাহ্ম-সমাজের প্রধান পুরুষরূপে চিহ্নিত কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও শিবনাথ শাস্ত্রী রামকৃষ্ণ-অনুগত-প্রাণ, তখন তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ নতুন আবেগে ব্রাহ্মধর্মের সারথি, উপনিষদের মন্ত্রে আত্মলীন। এ প্রসঙ্গও ভিন্নতর পটভূমিকায় আলোচিত হবে এমন আশা রাখি।

এখানে শুধু এটুকুই প্রতিপাদ্য যে, ব্রাহ্মধর্মের নেতৃত্ব গ্রহণ করার পর রবীন্দ্রনাথ একেশ্বরবাদের সাধক যেমন হয়েছিলেন, তেমনি একান্তভাবেই একেশ্বরবাদী উপনিষদের প্রতি হয়েছিলেন পরম বিশ্বস্ত —এটা কি প্রমাণিত সত্য? অর্থাৎ, ভারতের সনাতন ধর্ম, অবতার-বাদ ও পৌত্তলিকতাকে তিনি কি সর্বশক্তি দিয়ে বিসর্জন দিতে পেরেছিলেন? যদি পেরেছিলেন, তাহলে গীতার প্রতি এতটা অনুরাগ সেটাও কি কবিমানসের ফসল? অথবা, সেখানে রয়েছে কোন আন্তরিক আকর্ষণ?

রবীন্দ্রনাথ যদি সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে একান্তভাবেই একেশ্বরবাদী হতেন তাহলে সেটাই হত স্বাভাবিক ও সঙ্গত। ব্রাহ্মসমাজের নায়ক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের বাণী ও মর্মকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন, যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে বিচার করেছেন, মনন ও স্মরণ দিয়ে

ধারণ করেছেন, এটা সুপরিজ্ঞাত সত্য। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার প্রতি অনুরাগ—সেটা কি সনাতন ধর্মের ঐতিহ্যে লালিত পালিত ব্রাহ্মণ রবীন্দ্রনাথের সহজাত সংস্কারের ফলশ্রুতি নয়? নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং একেশ্বরবাদীর পক্ষে গীতা অনুরাগ কি পরস্পরবিরোধী বলে মনে হবে না? তবে রবীন্দ্রনাথের মত ঐশ্বর্যবান সকল স্তরের চিন্তা ও চেতনার ঐশ্বর্যে মহীয়ান হবেন, সেটা তো স্বাভাবিক।

যে প্রসঙ্গ আগেই আলোচিত হয়েছে, সেই প্রসঙ্গ এখানে আবার উপস্থাপিত হচ্ছে সঙ্গত কারণেই। গীতাও একটি উপনিষদ। উপনিষদসমূহের মতই গীতাও কম্বুকণ্ঠে আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব ঘোষণা করেছে। কিন্তু গীতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অবতারবাদ। যদিও শ্রীমদ্ভাগবতে অবতারবাদ প্রচারিত হয়েছে, তবু একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, গীতাতেই সর্বপ্রথম অবতারতত্ত্ব সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত। এই মহাগ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের সাত থেকে নয় শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন: যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের উত্থান হয়, তখন তিনি অবতীর্ণ হন। সাধুরক্ষা, দুষ্টবিনাশ ও ধর্মস্থাপনের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হন, ধারণ করেন নরদেহ। অবতারে বিশ্বাস হলে মুক্তি লাভ হয়, আর পুনর্জন্ম হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বলতেন, অবতারে বিশ্বাস পূর্ণ-জ্ঞানের লক্ষণ।

হিন্দু ধারণা ও বিশ্বাস অনুযায়ী অবতার হচ্ছেন নরদেহধারী ভগবান। দেহ ধারণকালে তিনি তাঁর ভাগবত স্বরূপ বিস্মৃত হন না। অবতারকে দর্শন করলেই ঈশ্বর দর্শন হয়। এ যুগের মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণকেও অবতারবরিষ্ঠ বলেই পূজা নিবেদন করেন।

বিশ্বের ধর্মেতিহাসে গীতার স্থান অনন্য। কারণ, এই মহাগ্রন্থে সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী প্রথম বিধৃত হয়েছে। কর্ম, যোগ, জ্ঞান ও ভক্তির এমন অপূর্ব সমন্বয় এক বিস্ময়কর উদারতার বাণীই বহন করে এনেছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখনিঃসৃত "যতমত ততপথ" গীতাতেই

বিশ্লেষিত এবং বিমূর্ত। গীতাতেই বলা হয়েছে যে, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ এবং কর্মযোগের প্রতিটি পথই অন্য-নিরপেক্ষ মোক্ষমার্গ। গীতার এই সমন্বয় একক এবং অনন্য।

গীতার এই বৈশিষ্ট্য এবং ভূমিকার কথা স্মরণে রেখেই একটা প্রশ্ন দেখা দেয়—নিরাকারবাদী এবং একেশ্বরবাদীর পক্ষে কি গীতার মর্মবাণীকে গ্রহণ করা সম্ভব? যিনি নিরাকারবাদী, তিনিই কি অবতারবাদী হতে পারেন? এ প্রশ্নের একটা স্পষ্ট উত্তর হচ্ছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—যিনি স্বীয় জীবনে সর্বধর্মের মহামিলন ঘটিয়েছেন, যিনি একই সঙ্গে সাকারবাদী, এবং নিরাকারবাদী, যিনি একই সঙ্গে ব্রহ্ম ও শক্তির উপাসক, যিনি স্বয়ং "যতমত ততপথের" প্রবক্তা।

কিন্তু জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িকে কেন্দ্র করে যে আদি ব্রাহ্ম-সমাজের ব্যাপ্তি ও প্রসার সেই ব্রাহ্মসমাজের কেউ "সর্বধর্মসমন্বয়" কিংবা "যতমত ততপথের" পথিক ছিলেন, এমন তথ্যপ্রমাণ হাতের কাছে নেই। বরং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার অর্পিত হয়েছিল যে তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথের ওপর, তিনিও বাহ্যিক আবরণে একজন পরিপূর্ণ নিরাকারবাদী, এমনকি সূচনাকালের ব্রহ্মচর্য আশ্রম এবং বর্তমানের বিশ্বভারতীতে মূর্তিপূজার প্রচলন নেই, সরস্বতী পূজাও নয়, আছে উপাসনার ব্যবস্থা, আছে মন্দিরে বসে নিরাকার ঈশ্বরের প্রতি পূজানিবেদনের ব্যবস্থা।

অর্থাৎ আদি ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীভূত ব্যক্তি ও ঘোরতর অবতার-তত্ত্বের বিরোধী প্রবক্তা ছিলেন বলেই কর্মে ও আচরণে একেশ্বরবাদী ও নিরাকারবাদী রূপেই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তবু প্রশ্ন থেকে যায়, বাইরের ধর্ম ও আচরণ কি সব সময় অন্তরের স্বীকৃতিতে অভিষিক্ত হয়েছিল?

এই প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ কতটা গীতা-অনুরাগী ছিলেন তা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। তবে তার আগে রবীন্দ্রনাথ স্বীয় পরিবারের সংস্কার ও ধর্মীয় অনুষঙ্গ হিসেবে যে বর্ণনা দিয়েছেন, সেটা স্মরণ করা যেতে পারে। "মানুষের ধর্ম" শীর্ষক রচনার পরিশিষ্টে তিনি

বলেছেন—আমার জন্ম যে পরিবারে, সে পরিবারের ধর্মসাধন একটি বিশেষ ভাবের। উপনিষদ এবং পিতৃদেবের অভিজ্ঞতা, রামমোহন এবং আর আর সাধকদের সাধনাই আমাদের পারিবারিক সাধনা। আমি পিতার কনিষ্ঠ পুত্র, জাতকর্ম থেকে আরম্ভ করে আমার সব সংস্কারই বৈদিক মন্ত্রদ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, অবশ্য ব্রাহ্মমতের সঙ্গে মিলিয়ে।

এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে সহজেই একজন অনুসন্ধিৎসু পাঠকের মনে হবে যে, বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড যেখানে প্রচলিত ছিল, সেখানে হিন্দু ধর্মের মৌল ধারণাগুলি উপেক্ষিত ছিল না নিশ্চয়ই। তবে সেক্ষেত্রে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে ব্রাহ্মমতের মিলন ঘটাবার একটা প্রয়াস ছিল সক্রিয়। সেক্ষেত্রে ব্রাহ্মমত কতটা ব্যাপ্ত হতে পেরেছিল, উপনিষদের বাণী কতটা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিতেই পারে। সংশয় দেখা দেয় আরেকটি কারণে, যে পরিবারে ব্রাহ্মসমাজের গোঁড়ামি ছিল, সেই পরিবারের কনিষ্ঠ সন্তানের ওপর উপনিষদের মন্ত্র এবং রীতিনীতি নিশ্চিত ভাবেই প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়েছিল।

অথচ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—আমাদের পরিবারে যে ধর্মসাধনা ছিল আমার সঙ্গে তাহার কোন সংশ্রব ছিল না, আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই। (জীবনস্মৃতি)। সম্ভবত সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের রচনায় উপনিষদের কোন স্পষ্ট ছায়া নেই, নেই প্রভাবও। আচরণ এবং হৃদয়—এই দুয়ের যোগসূত্রে কোথাও হয়ত কিছুটা ফাঁক ছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ যখন একেশ্বরবাদী উপনিষদকেই অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেন, যখন বলেন : আমার জীবনের মহামন্ত্র পেয়েছি উপনিষদ থেকে, (চিঠিপত্র ৯ পত্র ২০) তখন আমরা কিছুমাত্র বিস্মিত হই না। কারণ ভারতীয় আত্মার বাণীমূর্তি যে রবীন্দ্রনাথ, তাঁর পক্ষে বিশেষ কোন ধর্মবন্ধনের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকা সম্ভব নয়। তাই তিনি ভারতীয় ভাবধারা এবং আদর্শকেই অবলম্বন করেছেন, সমৃদ্ধ করেছেন এবং স্বীয় দীপ্তির বৈভবে প্রমূর্ত করে তুলেছেন।

অবশ্য উপনিষদভিত্তিক ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপয়িতা একেশ্বরবাদী রামমোহনও ভগবদ্‌গীতা পদ্যে অনুবাদ করেছিলেন বলে শোনা যায়। সেই অনুবাদকৃত গীতা এখন আর পাওয়া যায় না। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পুস্তকে এই গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত এবং দিগ্‌ভ্রান্ত ইংয়বেঙ্গল সমাজ খ্রীষ্টধর্মের দেশীয় সংস্করণ ব্রাহ্মধর্মের টানে গীতাকে উপেক্ষা করতে থাকেন। গীতাকে উপেক্ষা করেই যেন নিরাকারবাদী ঈশ্বরের সেবায় সেই বিভ্রান্ত শ্রেণী আত্মগত হন।

লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, ব্রাহ্মধর্মের পথপ্রদর্শক রামমোহন, রামমোহনের অনুগামী দেবেন্দ্রনাথ এবং দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথ, তাঁরা সকলেই কোন না কোন ভাবে গীতার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, কোন না কোন ভাবে গীতার চর্চা করেছিলেন। আসলে গীতাকে বাদ দিয়ে কোন ধর্মনায়কই এদেশের মাটিতে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন নি। সম্ভবত তাঁদের সে রকম কোন সাধ ছিল না, ছিল না সাধ্যও।

দেবেন্দ্রনাথও বিশেষভাবে গীতার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন, ব্রহ্মোপাসক এবং বৈদিক সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়েও তিনি যে কতটা গীতা অনুরাগী ছিলেন, তা সপ্রমাণিত তাঁর 'ব্রাহ্মধর্ম' নামক গ্রন্থে। আত্মজীবনীতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলেছেন : মহাভারত, গীতা, মনুস্মৃতি প্রভৃতি পড়িতে লাগিলাম। শুধু এই নয়, অনুসন্ধিৎসু পাঠক যদি এ ব্যাপারে যত্নবান ও আগ্রহী হন, তাহলে সামান্য আয়াসেই দেখতে পাবেন যে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (১৮৯৭—'৯৯) ভগবদ্‌গীতা বিষয়ে বক্তৃতা ও ভগবদ্‌গীতা থেকে শ্লোক সংগ্রহ দেবেন্দ্রনাথের আগ্রহেই ক্রমান্বয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

এসব ঘটনাই কি প্রমাণ করে না যে, একেশ্বরবাদী হয়েও দেবেন্দ্রনাথ আত্মগত চেতনায় গীতার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তা ছাড়া দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় ভ্রাতৃপ্রতিম ব্রহ্মবান্ধব কেশবচন্দ্র সেনকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্যপদে বরণ করতেও আপত্তি করেছিলেন। আচার্য

পদে স্বীকার করেন নি, কারণ কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মণ ছিলেন না—এই ঘটনার দ্বারাই ব্রাহ্মণ দেবেন্দ্রনাথের জন্মগত সংস্কার প্রকট হয়ে পড়েছিল। অথচ, শ্রীরামকৃষ্ণ কত সহজেই পুত্রপ্রতিম নরেন্দ্রনাথ দত্তকে সন্ন্যাস দিয়েছিলেন, যদিও প্রচলিত রীতিতে শুধু ব্রাহ্মণেরই সন্ন্যাসে অধিকার স্বীকৃত।

দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথ কি একেশ্বরবাদী হয়েও গীতানুরাগী ছিলেন, এ প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রচর্চায় খ্যাতিমান অনেকেই নেতিবাচক উত্তর দিয়েছেন। প্রচলিত ধারণায় এই আংশিক সত্যই প্রতিষ্ঠিত যে রবীন্দ্রনাথ-উপনিষদ্ প্রেমিক এবং তাঁর উপনিষদপ্রীতি সম্পর্কিত অতি প্রচারের ফলেই তাঁর গীতাপ্রীতি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, তাই ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের মত সুপণ্ডিতও বলেন : I can not help pointing out in this connection that Tagore's voluminous writings do not contain more than half a dozen reference to the Gita (An Artisan in life, P. 45) একটা কথা এই পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্ট করেই বলা যায় যে, ডঃ রায় এমন একটা উক্তি করে রবীন্দ্রনাথের কীর্তি ও বৈভবের প্রতি সুবিচার করেন নি। সম্ভবত নীহারবাবু এ ব্যাপারে ততটা যত্নশীল হওয়ার সময় পান নি।

শৈশব থেকেই, যখন উপনিষদকে কবি মানেন নি পর্যন্ত, তখন থেকেই গীতার সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র স্থাপিত হয়। রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন হয় এগারো বছর নয় মাস বয়সে এবং উপনয়ন হয় বৈদিক মতে। তারপর পিতা দেবেন্দ্রনাথের নির্দেশে ও প্রেরণায় তিনি গীতাপাঠ শুরু করেন। কবি তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে বলছেন : ভগবদ্গীতায় পিতার মনের মত শ্লোকগুলি চিহ্নিত করা ছিল, সেইগুলি বাংলা অনুবাদ সমেত আমাকে কপি করিতে দিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, মহর্ষি 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় যে গীতাশ্লোক-সংগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, সম্ভবত সেগুলিই 'মনের মত শ্লোক।' মহর্ষির এই শ্লোকসংগ্রহ থেকেই কয়েকটি শ্লোক রবীন্দ্রনাথ

স্বীয় সাহিত্যকর্মে প্রসঙ্গক্রমে ব্যবহার করেছেন। তারপর ১৯২৮ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে (সমাজ, পরিশিষ্ট) রবীন্দ্রনাথ দেশ ও জাতিকে বলশালী ও উন্নতমনা করার জন্য গীতার কর্মযোগ স্মরণ করেন, বলেন : শ্রীকৃষ্ণ (গীতায়) কর্মকে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন। কর্মেই মনুষ্যের আত্মশক্তি বা আধ্যাত্মিকতার বলবৃদ্ধি হয়। প্রবৃত্তির সাহায্যে কর্মের সাধন এবং কর্মের দ্বারা প্রবৃত্তির দমনই সর্বোৎকৃষ্ট।

অসংখ্য উদ্ধৃতি ও প্রসঙ্গ উত্থাপন করেই এই সত্য প্রমাণ করা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ একনিষ্ঠ চিত্তেই গীতা-অনুরাগী ছিলেন। তবে অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে উপরে উল্লিখিত একটি মাত্র উক্তিকেই যদি সম্বল করি, তাহলেই একথা সপ্রমাণিত হয় যে, গীতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অসীম শ্রদ্ধা এবং গভীর উপলব্ধিজনিত প্রসন্নতা ছিল। তবে এটাও আগ্রহী পাঠকের নজরে পড়ার কথা যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর রবীন্দ্রসাহিত্যে ওই একটি প্রবন্ধে যতখানি ও যেভাবে গীতার উল্লেখ আছে, তেমন আর কোথাও উপস্থিত নেই। চিঠিপত্রে অসংখ্যবার গীতাপ্রসঙ্গ উক্ত সময়সীমার মধ্যে উল্লিখিত হলেও বিশেষভাবে কোন প্রবন্ধ বা রচনায় কেন অনুল্লিখিত—তা নিয়ে পর্যালোচনার অবকাশ আছে।

তৎকালীন দেশীয় ও সামাজিক পরিবেশ ও পরিমণ্ডলের কথা স্মরণে রেখে এমন একটা অনুমান করা হয়ত অসঙ্গত হবে না যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে একযোগে খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রচার এবং ব্রাহ্মধর্মের প্রতিক্রিয়ায় আত্মরক্ষার প্রয়োজনে, এবং স্বধর্ম প্রতিষ্ঠায় হিন্দুধর্মের নবজাগরণ ঘটেছিল। সে সময় সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রতীক হিসেবে এবং নবযুগের প্রবর্তকরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব হয়ে পড়েছিল দেশ ও কালের পক্ষে অনতিক্রম্য। আর এই পটভূমিকায় হিন্দুধর্মের নবজাগরণে প্রধান সহায় হয়েছিল গীতা।

সে যুগে ভাবের আতিশয্যে অনেকেই অক্ষমতা-জনিত কারণে নানাভাবে গীতার অপব্যাখ্যা করতে থাকেন। এ প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের

হাসির গান 'গীতা আবিষ্কার' স্মরণীয়। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র সে সময়েই কৃষ্ণচরিত্র, ধর্মতত্ত্ব ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতা নামক তিনখানি গ্রন্থ রচনা করে গীতার বাণী ও মর্মবাণী নবশক্তিতে তুলে ধরেন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে গীতার নিষ্কাম কর্মতত্ত্বের বাণীই যেন আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী আর সীতারাম উপন্যাসের আড়ালে স্বমহিমায় বিরাজিত। এছাড়া কালীপ্রসন্ন সিংহ বা রমেশ দত্ত প্রমুখ মনীষীরাও গীতার অনুবাদ বা ভাষ্য রচনা করেছিলেন।

এসব ঘটনার পাশাপাশি একদল অত্যুৎসাহী "গোঁড়াহিন্দু" নিজেদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও বুদ্ধিকে সম্বল করে "গীতা মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা" তথা প্রচারের নামে এমন সব উদ্ভট কাণ্ডকারখানা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, যা সুস্থ, মননশীল এবং যুক্তিবুদ্ধিশীল মানুষকে আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছিল স্বাভাবিক কারণেই। রবীন্দ্রনাথ আন্তরিকভাবে গীতা-অনুরাগী হয়েও গীতার নামে ওই বাড়াবাড়ি মেনে নিতে পারেন নি। পারেন নি যে, সেটা স্পষ্ট হয়েই ধরা পড়ে 'মানসী' কাব্যের ধর্মপ্রচারক কবিতায়। পারেননি যে, সেটা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে 'মুক্তির উপায়' নাটিকায় দারুণ গুরুভক্ত কবির সম্বন্ধে তার স্ত্রী বলছে: ওঁর বিশ্বাস, ওঁর রক্তে গীতার বন্যা বয়ে যাচ্ছে।

সম্ভবত গীতা নিয়ে বাড়াবাড়ির কালে "ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ" সাময়িক প্রয়োজনে এবং ব্রাহ্মসমাজের দিকে তাকিয়েই কিছুকাল উদাসীন থাকেন। বিশেষ করে গীতা সম্পর্কে সে সময় আদি ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই কিছুটা কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। অবশ্য সেই মনোভাব কতটা আন্তরিক এবং কতটা লোকদেখানো ছিল তা নিয়েও বিতর্ক চলতে পারে। তবে রবীন্দ্রনাথ যে গীতা সম্পর্কে সে সময় কিছুকাল উদাসীন ছিলেন, সেটা একান্তভাবেই ইচ্ছাকৃত এবং একটা স্ট্র্যাটেজী হিসেবে। কারণ, জ্ঞানোন্মেষের কাল থেকেই যিনি গীতার সুত্রে গ্রথিত, যিনি অন্তরের শ্রদ্ধা দিয়েই গীতাকে বরণ করে নিয়েছেন, তিনি সাময়িক প্রয়োজনে উদাসীন থাকলেও আবার গীতা নিয়ে বাড়াবাড়ির প্রবণতা কমার সঙ্গে সঙ্গেই গীতা পর্যালোচনায় আত্মগত হন।

আমরা দেখতে পাই "ভারতবর্ষের ইতিহাস" এবং "ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা" প্রবন্ধ দুটি এক দশকের ব্যবধানে যথাক্রমে ১৩০৯ এবং ১৩১৯ সালে প্রকাশিত হয় এবং এই দুটি প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ গভীর অন্বেষণী দৃষ্টি নিয়ে ভারত ইতিহাসের মূল সূত্রের সন্ধানে অভিযাত্রা করেছেন। এ যেন গঙ্গোত্রীর লক্ষ্যে অভিযান। আর এই অভিযাত্রায় তিনি দেখেছেন ভারত ইতিহাসে, সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসে গীতার অপরিসীম গুরুত্ব এবং অবিচল স্থান। এ ব্যাপারে কবিগুরু যে আশ্চর্য গভীর ও অভ্রান্ত অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, তা বিস্ময়াভিভূত চোখে আমরা লক্ষ্য করি।

যে সময়কালের মধ্যে উক্ত প্রবন্ধ দুটি রচিত হয়েছে, তারই পাশাপাশি সময়ে (১৩১৫-১৩২২ সন) রবীন্দ্রনাথ উপনিষদকেই যেন মন প্রাণ সমর্পণ করেছেন, তবু, তাঁর অন্তরের অন্তস্তলে যে গীতা-অনুরাগের ফল্গুধারা প্রবাহিত হচ্ছিল সেটা দেখতে পাই "শান্তিনিকেতন" বক্তৃতামালায় ধর্ম ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বিচ্ছিন্নভাবে গীতার প্রসঙ্গ বা গীতার শ্লোক উপস্থিত করেছেন। এর পরই আমরা লক্ষ্য করি কবিগুরুর 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি'র (১৩৩১) বিভিন্ন প্রসঙ্গে গীতার উল্লেখ। কোন রকম জড়তা বা দ্বিধা না রেখেও এ কথাটা অতি সহজেই বলা যায় যে, কবিগুরু একেশ্বরবাদী উপনিষদের মর্মমূলে মন-প্রাণ সমর্পণ করলেও, অবতারবাদী গীতার বেদীমূলে সমর্পণ করেছেন বুদ্ধি ও চেতনাকে।

তাই তিনি দিলীপকুমার রায়কে লিখিত এক পত্রে বলেন : গীতার একটি শ্লোকের আরম্ভ এই 'অপরং ভবতো জন্ম', ঠিক তার পরবর্তী শ্লোক· 'বহুনি মে ব্যতীতানি'। দ্বিতীয়টির সমান ওজনে প্রথমটি যদি লিখতে হয়, তাহলে লেখা উচিত 'অপারং ভবতো জন্ম'। কিন্তু যাঁরা এই ছন্দ বানিয়েছিলেন তাঁরা ছান্দসিকের হাটে গিয়ে নিক্তি নিয়ে বসেন নি। (পত্র ধারা, দ্বিতীয় পর্যায়, পত্র-৩, ছন্দ)। এই একটি উক্তি থেকেই বোঝা যায় যে, গীতা অনুশীলনে কবি তাঁর ভাব ও ভক্তিকেই শুধু প্রশ্রয় দেন নি, সেই সঙ্গে প্রাধান্য দিয়েছেন বুদ্ধি ও

চেতনাকে। তাই তিনি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার মহিমা ও সাহিত্য-মূল্য নিরূপণে ব্রতী হয়েছেন, বিশ্লেষণে হয়েছেন অন্বিষ্ট।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন: গীতা বেদের সর্বোত্তম ভাষ্য। ব্রহ্মবিদ্যাই গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়। ব্রাহ্মীস্থিতি বা ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করা, গুণাতীত যোগারূঢ় বা স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়াই গীতার উপদেশ। কুরুক্ষেত্রে মহাসমরে উপস্থিত অর্জুন তাঁর নিকটজন, আপনজন ও আত্মীয়বর্গকে যুদ্ধার্থে সমাগত ও প্রস্তুত দেখে ম্রিয়মাণ ও দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন: স্বজনগণকে বিনাশ করে তিনি রাজ্যলাভ করতে চান না। তখন শ্রীকৃষ্ণ সেই মহাসমরক্ষেত্রে পার্থ-সারথিরূপেই অর্জুনের মন থেকে সকল সংশয় ও মৃত্যুভয় দূর করার জন্য আত্মার অমরত্ব শিক্ষা দিলেন, বললেন: এই নরপতিগণ ও আমরা পূর্বে ছিলাম না, বা পরে থাকব না, এ সত্য নয়। অর্থাৎ, আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, আত্মা অমর।

অনেকের মনেই একটা প্রশ্ন দেখা দেয়: কুরুক্ষেত্র মহাসমরের প্রাক্কালে যুদ্ধক্ষেত্রে এসব উপদেশ দেওয়া কি সম্ভব? এসব উপদেশ কি যুদ্ধক্ষেত্রে দেওয়া যায়? প্রশ্ন করেন কেউ কেউ: যুদ্ধক্ষেত্রে গীতা কিরূপে উপদিষ্ট হল? এ প্রসঙ্গে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ সম্ভবত অপ্রার্থিত হবে না। রোমান সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস যে যুদ্ধে গিয়ে নিহত হন, সেই যুদ্ধে যাওয়ার তিনদিন আগে তিনি এক অভিনব কীর্তি স্থাপন করেছিলেন। তিনি স্বীয় রাজধানীর সকল দার্শনিক ও বিদ্বানকে রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ জানিয়ে আনেন এবং সমাগত দার্শনিক ও পণ্ডিতদের সঙ্গে দর্শন নিয়ে গভীর আলোচনা করেন। যুদ্ধ-যাত্রা করার আগে একজন নৃপতি যদি তিনদিন দর্শন নিয়ে আলোচনা করতে পারেন, তাহলে যুত্রক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ দেওয়াটা কিভাবে অসমীচীন হয়?

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন: ভগবদ্‌গীতার মাহাত্ম্য কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। কিন্তু যখন কুরুক্ষেত্রের তুমুল যুদ্ধ আসন্ন, তখন সমস্ত ভগবদ্‌গীতা অবহিত হইয়া শ্রবণ করিতে

পারে, ভারতবর্ষ ছাড়া এমন দেশ জগতে আর নেই। (প্রাচীন সাহিত্য, কাদম্বরী চিত্র)। আরেক জায়গায় তিনি বলছেন: কুরুক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে এই যে খানিকটা দার্শনিকভাবে আলোচনা, এটাকে কাব্যের দিক থেকে অসংগত বলা যেতে পারে; এমনও বলা যেতে পারে যে, মূল মহাভারতে এটা ছিল না। পরে যিনি বসিয়েছেন, তিনি জানতেন যে উদার কাব্যপরিধির মধ্যে ভারতের চিত্তভূমির মাঝখানে এই তত্ত্বকথার অবতারণা করার প্রয়োজন ছিল। (মহাত্মা গান্ধী, ১৩৪৪)

একই প্রশ্ন তুলে ধরে 'সাহিত্যের স্বরূপ' এ তিনি যেন বুদ্ধি ও বিশ্লেষণী মনোভাব নিয়েই বলেছেন: কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে থমকিয়ে রেখে সমস্ত গীতাকে আবৃত্তি করা সাহিত্যের আদর্শ অনুসারে নিঃসন্দেহে অপরাধ। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রকে গীতার ভাবের দ্বারা ভাবিত করার সাহিত্যিক প্রণালী আছে, কিন্তু সৎকথার প্রলোভনে তার ব্যতিক্রম হয়েছে বললে গীতাকে খর্ব করা হয় না। কবিগুরুর এই সব উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে একটা সত্য অতি সহজেই আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে, সেটা হচ্ছে এই যে, তিনি গীতার মাহাত্ম্য এবং গীতার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় আগাগোড়াই যত্নবান ছিলেন। ছিলেন বলেই তথাকথিত সমালোচকদের যুক্তি ও তর্ককে খণ্ডন করার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় তিনি গ্রহণ করেছিলেন। মনে প্রাণে যদি তিনি উপনিষদ অনুসারী একেশ্বরবাদী হতেন, যদি তিনি অবতার ও দেবতামুখী গীতার প্রতি অনুরক্ত না হতেন, তাহলে এসব ব্যাপারে নীরব থাকতে পারতেন, এভাবে স্বয়ং অগ্রসর হয়ে গীতার পক্ষে সওয়াল করার দায়িত্ব নিতেন না।

গীতা নিয়ে যাঁরা অহেতুক বাগাড়ম্বর শুরু করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের 'ঘরে বাইরে' ও 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে কটাক্ষ করেছেন এটা যেমন ঘটনা, তেমনি ঘটনা হচ্ছে এই যে, গীতার উপদেশগুলির ব্যবহারিক উপযোগিতা সম্পর্কে তিনি ছিলেন নিঃসংশয়, 'কালান্তর' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে তার প্রমাণ পাই। স্বাধীনতা-আন্দোলনে গীতার অপ্রতিরোধ্য এবং দুর্জয় প্রভাবও কবি লক্ষ্য করেছেন, স্বীকার করেছেন। "সংস্কার" গল্পে কবি বলেছেন: তখনকার পুলিশ কারও

বাড়ীতে গীতা দেখলেই সিডিশনের প্রমাণ পেত। "নামঞ্জুর" গল্পেও গীতার উল্লেখ স্পষ্ট। তবে 'জাভাযাত্রীর পত্রে' রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে গীতার বাণীর প্রতি গ্রথিত করেছেন নিজের দ্বিধাহীন সমর্থন, সে ভাবে অন্যত্র লক্ষ্য করি না। আগ্রহী পাঠককে আমরা উক্ত পর্যায়ের পঞ্চম পত্রটি দেখতে বলি। সেখানে কবি অপরূপ ভঙ্গিতে গীতার নিষ্কাম কর্মের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

মোট কথা, রবীন্দ্রনাথ বাহ্যিক আচরণে একেশ্বরবাদী বা নিরাকার-বাদী হিসাবে আত্মস্থ হওয়ার প্রয়াসী হলেও সেটা নিতান্তই যে আনুষ্ঠানিক, বা বাহ্যিক, সে বিষয়ে সংশয় থাকে না তখন, যখন দেখি তিনি গীতার ভাবেও গভীরভাবে আত্মমগ্ন।

শিবময় রবীন্দ্রভাবনা

"অপৌত্তলিক রবীন্দ্রনাথ" যখন মুক্তনেত্রে শিবের জটার বাঁধন খুলে যেতে দেখেন, যখন তৃতীয় নয়নে প্রত্যক্ষ করেন শিবের "প্রলয় নাচন", তখন সেই দর্শনের ভঙ্গিতে কিছুমাত্র স্ববিরোধিতার লক্ষণ দেখি না। কারণ ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ যতখানি ব্যাপ্ত ও গভীর স্বজীবনে, কবি রবীন্দ্রনাথ তার চাইতে অনেক বেশী বিস্তৃত ও সুগভীর। সেই জন্যই কল্পনার বর্ণময়তায় রবীন্দ্রনাথ পুতুল-শিবের বিভিন্ন মূর্তিকে মুগ্ধ-বিস্ময়েই প্রত্যক্ষ করেন এবং তাঁর চেতনা ও এষণা শিবময়তায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় বারবার।

শিবের বিভিন্ন রূপ এবং বিভিন্ন প্রকাশ আমরা বিস্ময়কর ভাবেই রবীন্দ্রসৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করি। সম্ভবত, "নটরাজ শিব" রবীন্দ্রনাথকে সব থেকে বেশী অভিভূত করেছেন—কারণ, রবীন্দ্রনাথ কাব্যছন্দ, সুরছন্দ এবং দেহছন্দের মিলন ঘটিয়ে যে নতুন সৃষ্টিতে মগ্ন ছিলেন, সেই সৃষ্টির প্রত্যক্ষ প্রেরণা শিবের নটরাজ মূর্তিতেই বিধৃত।

মূর্তি হচ্ছে প্রতীক এবং ধ্যানমন্ত্রে দেবতার যে রূপ কল্পনা করা হয়,

সেই রূপকেই প্রতীক হিসাবে মূর্তির মাধ্যমে তুলে ধরা হয় সহজ অনুসরণের জন্য। এটা পুতুল-পূজা, না পুতুলকে সামনে রেখে অনন্ত-অসীমেরই আরাধনা—তা নিয়ে বর্তমান প্রসঙ্গে আপাতত বিতর্কের অবকাশ নেই। শিবের ধ্যানমন্ত্রে আমরা যে মূর্তি পাই, তাতে দেখা যায়, "শিবতত্ত্বের সামগ্রিক মাহাত্ম্য তার মধ্যেই বীজাকারে নিহিত।" স্বামী নির্মলানন্দ-রচিত "দেবদেবী ও তাঁদের বাহন" গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে আমরা এ ব্যাপারে আলোকিত হতে পারি। শিবের বিভিন্ন রূপ ও চরিত্র আমরা পাই শিবের ধ্যানমন্ত্র অনুসারে : মহাদেব শিব, মহাযোগী শিব, সংহারকারী শিব, আশুতোষ শিব, পরম মঙ্গলময় শিব, জগতের আদি কারণ ও বিশ্বপ্রতিপালক শিব। "ধ্যানমন্ত্রে শিবমাহাত্ম্য সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ যা বলা হয়েছে, বেদ-পুরাণাদি গ্রন্থে সে সকল মাহাত্ম্যই সবিস্তারে কীর্তিত।"

"শিব" শব্দটির উল্লেখ বেদে আছে, তবে তা রুদ্রের বিশেষণ রূপে। কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করেন, শিবকে বৈদিক দেবতা হিসাবে মেনে নিতেও রাজী হন না। যুক্তি হিসাবে বলেন : বৈদিক যাগযজ্ঞে শিবের হবির্ভাগ ছিল না। তাঁরা শিবকে অনার্য দেবতা হিসাবেই চিহ্নিত করেন। অনেকে বলেন, দক্ষযজ্ঞ পণ্ড হওয়ার পরই অন্যান্য বৈদিক দেবতার মতই শিবের জন্য যজ্ঞভাগ নির্ধারিত হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে যে হিরণ্ময় পুরুষের কথা বলা হয়েছে, তিনি শিব ছাড়া অন্য কেউ নন। আমাদের শিবপুরাণেও শিবের মাহাত্ম্য বর্ণিত। প্রকৃতপক্ষে বৈদিক রুদ্র ও পৌরাণিক শিব যে অভিন্ন, তা আমরা একটু যত্নবান হলেই দেখতে পাব। বেদের রুদ্র ভয়ানক, পৌরাণিক শিবও প্রলয়ের দেবতা; বেদের রুদ্র শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক, পৌরাণিক শিবের নাম বৈদ্যনাথ এবং বেদের রুদ্র কল্যাণপ্রদ, পৌরাণিক শিবও মঙ্গলময়।

এখানে শিবতত্ত্ব আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। শুধু প্রাসঙ্গিকতার কারণেই বিষয়টি অনুসরণ করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ শিবের বিভিন্ন রূপ যখন প্রত্যক্ষ করেন, তখন শিবের বিভিন্ন প্রচলিত মূর্তিকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। রবীন্দ্রচেতনায় বারবার প্রমূর্ত শিব একই

সঙ্গে বৈদিক এবং পৌরাণিক, একই সঙ্গে পৌরাণিক এবং লৌকিক। ভিন্ন পটভূমিকায় এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ আছে।

অনার্য বা আর্য শিবের ক্রমবিবর্তনের ধারাটি রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকেই অনুসরণ করেছেন। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" (সাহিত্য) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : ভারতবর্ষের কটাহে আর্য অনার্য নানাজাতির সংমিশ্রণ হইয়াছিল। এক এক সময়ে এক এক জাতি ফুটিয়া উঠিয়া আপন আপন দেবতাকে জয়ী করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ নানা ঘটনা-প্রবাহের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, বৈদিক যুগে যে-মহাদেবের তেমন কোন আধিপত্য ছিল না, সেই মহাদেবই কালক্রমে "এক সময় অধিকাংশ ভারত অধিকার করিয়া লইলেন।" কবি কথাসরিৎসাগরের কাহিনীকে আশ্রয় করেই শিবের প্রাধান্য প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে 'মহাদেব', 'মহেশ্বর', 'বিশ্বেশ্বর' প্রভৃতি নামমাহাত্ম্যেই শিবের প্রাধান্য-সূচক মাহাত্ম্য সূচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই মাহাত্ম্যেই বিশেষভাবে আবিষ্ট এবং আকৃষ্ট—যা তাঁর শিব-ভাবনারই পরিণতি। শিবের সার্বভৌমত্ব ও প্রাধান্য প্রমাণ করার জন্য কবি 'কুমারসম্ভব', 'কাদম্বরী' প্রভৃতি কাব্যের গবাক্ষে চোখ মেলেছেন। তিনি দক্ষযজ্ঞ কাহিনীর মধ্যেই শিব-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে প্রত্যক্ষ করেছেন (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। 'পারস্যযাত্রী' গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে কবি বলেছেন : সেদিনকার দ্বন্দ্বের একটা ইতিহাস আছে পুরাণকথায়, দক্ষযজ্ঞে। একদা বৈদিক হোমের আগুন নিবিয়েছিল শিবের উপাসক।

এ প্রসঙ্গে একটি মজার ব্যাপার লক্ষ্য করার মত। যিনি এবং যাঁর সহচররা তাণ্ডবে ও প্রলয়নাচনে লোকে-লোকান্তরে যজ্ঞ পণ্ড করেন, সেই শিবই কালক্রমে এ দেশের সংসারে 'যজ্ঞেশ্বর'-এর আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। দেবতাদের আধিপত্য ও প্রাধান্য বিস্তৃত ও সঙ্কুচিত হওয়ারও একটা কালক্রমিক ইতিহাস আছে। তাই দেখি, একদা-সঙ্কুচিত শিব-মাহাত্ম্য কালক্রমে যেমন বিস্তৃত হয়েছে, তেমনি

আবার পরবর্তী কালে শিব-মাহাত্ম্যকে সীমায়িত করে শক্তি-মাহাত্ম্য হয়েছে বিস্তৃত। রবীন্দ্রনাথ মননশীল দৃষ্টিতে এই হ্রাস-বৃদ্ধির গতি-প্রকৃতি অনুধাবন করেছেন।

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" প্রবন্ধে কবি ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, শক্তির চণ্ডমূর্তি "ক্রমশঃ মাতা অন্নপূর্ণার রূপে, ভিখারীর গৃহলক্ষ্মী রূপে, বিচ্ছেদ-বিধুর পিতামাতার কন্যারূপে" রূপান্তরিত হয়ে যায়, আর সেই সেই রূপের মধ্যেই প্রেমভক্তি মূর্ত হয়ে ওঠে। দেবতা তখন আর দূরবর্তী দেবতা নন, তখন তিনি নিকট-জন ; দেবতা নেমে আসেন মর্ত্যের মাটিতে। বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলি এই রূপান্তরের জীবন্ত নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথ 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের "গ্রাম্য সাহিত্য" প্রবন্ধে বলেছেন : অন্নদামঙ্গল ও কুমারসম্ভবের আখ্যানে প্রভেদ অল্প, কিন্তু অন্নদামঙ্গল কুমারসম্ভবের ছাঁচে গড়া হয় নাই। তাহার দেবদেবী বাংলাদেশের গ্রাম্য হরগৌরী।

হরগৌরীকে নিয়ে আমাদের গ্রাম্য ছড়া, কাহিনী, লোক-কথা ইত্যাদির অন্ত নেই। এখানে শিব আমাদের ঘরের মানুষ, গৌরী আমাদের ঘরের কন্যা। "গ্রাম্য সাহিত্যে" কবি এই রূপান্তর প্রসঙ্গে বলেছেন : শ্রুতি ইহার মূল নহে, লোকের কল্পনাই ইহার মূল, দেবতাকে নিজ পরিমাণে নির্মাণ-চেষ্টাই ইহার প্রধান কারণ। কবি গ্রাম্য ছড়ায় হরগৌরীর স্থান নির্ণয় করতে প্রয়াসী হয়ে উক্ত প্রবন্ধে বলেছেন : হরগৌরী সম্বন্ধীয় গ্রাম্য ছড়াগুলি বাস্তব ভাবের।…সেই জামাতার নিন্দা, স্ত্রী পুরুষের কলহ ও গৃহস্থালির বর্ণনা যাহা আছে, তাহাতে রাজভাব ও দেবভাব কিছুই নাই……তাহাতে কৈলাস ও হিমালয় আমাদের গ্রাম্য পুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাদের শিখররাজি আমাদের আমবাগানের মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই।

আগ্রহী পাঠক একটু সতর্ক হলেই এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ভাবনায় আশ্চর্য মিল খুঁজে পাবেন। গুপ্তকবির "মনের প্রতি উপদেশ" শীর্ষক কবিতায় শিবের বিচিত্র রূপ বর্ণিত

হয়েছে। আর রবীন্দ্রনাথের কল্পনা-ঐশ্বর্যে শিবের বিচিত্র রূপ নব নব প্রকাশে ও বৈভবে বিচিত্রতর হয়ে উঠেছে। আমরা সেদিকে দৃষ্টি ফেরাতে পারি।

'ভারতী' পত্রিকার ১২৮৮ বাংলা সনের মাঘ-সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ "সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়" নামে একটি গদ্য রচনা প্রকাশ করেন। ওই একই বছরে ভারতীতে ওই একই নামে তিনি একটি কবিতাও লেখেন, যেটা পরে 'প্রভাত সঙ্গীত' গ্রন্থে সংযোজিত হয়। এ প্রসঙ্গে আমরা রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য স্মরণ করতে পারি। ('রবীন্দ্র জীবনী', প্রথম খণ্ড, ১৩৪ পৃঃ)। তিনি বলেছেন : "সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়" লেখকের মতে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সমগ্র ব্যাপারটা নিরবচ্ছিন্ন কালের মধ্যে প্রতিভাত হইতেছে। কবির মতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়—এই তিনকে এক করিয়া দেখিবার একটি পদ্ধতি আছে এবং তিনটিকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখিবারও একটি পদ্ধতি আছে; প্রথমটিকে লেখক 'সংক্ষেপ' এবং দ্বিতীয়টিকে 'বিক্ষেপ' আখ্যা দান করেছেন।.........বিক্ষিপ্ত ভাব অসীম ব্রহ্মাণ্ডে নব নব ভাবে নব নব মূর্তিতে প্রকাশমান; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের প্রকাশ সে মূর্তিতে; কিন্তু মঙ্গলই একমাত্র উদ্দেশ্য—যেহেতু জ্ঞান এবং প্রেম সকলের মূলে বর্তমান।

রবীন্দ্র-জীবনীকার বলেছেন: "সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়"—প্রথমেই ব্রহ্মার পরিকল্পনা, যিনি সৃষ্টি করিয়া নিশ্চিন্ত মনে আছেন—

দেশশূন্য কালশূন্য জ্যোতিঃশূন্য মহাশূন্য-'পরি
চতুর্মুখ করিছেন ধ্যান,
মহা অন্ধ অন্ধকার সভয়ে রয়েছে দাঁড়াইয়া
কবে দেব খুলিবে নয়ান।

এর পরই বিষ্ণুর আবির্ভাব। এই আবির্ভাব প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

অনন্ত আকাশে দাঁড়াইয়া
চারিদিকে চারি হাত দিয়া

বিষ্ণু আসি মন্ত্র পড়ি দিলা
বিষ্ণু আসি কৈলা আশীর্বাদ।

বিষ্ণুর নিয়মচক্রে বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত হ'ল, বাঁধা পড়ল, চলতে লাগল নিয়ম অনুসারে। তারপর সেই মহাছন্দে বাঁধা হওয়ার দরুন অসীম জগৎ-চরাচরের "শ্রান্ত হয়ে এল কলেবর"। তখন মহাদেবের শরণ নিতে হল, বিশ্ব-জগৎ বলল : একবার ছেড়ে দাও, দেব! অনন্ত এ আকাশ মাঝারে। তখন মহাদেব কি করলেন? তিনি "প্রলয় বিষাণ তুলি করে ধরিলেন শূলী/পদতলে জগৎ চাপিয়া,…/ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল/জগতের সমস্ত বাঁধন। তারপর কি হল?

কে কোথায় ছুটে গেল
ভেঙ্গে গেল, টুটে গেল,…
সৃজনের আরম্ভ-সময়ে
আছিল অনাদি অন্ধকার,
সৃজনের ধ্বংস—যুগান্তরে
রহিল অসীম হুতাশন।
অনন্ত আকাশ-গ্রাসী অনল সমুদ্র মাঝে
মহাদেব মুদি ত্রিনয়ন
করিতে লাগিল মহাধ্যান।'

এক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করি যে, রবীন্দ্রনাথ কাব্যসুষমায় যে ভাবে "সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ে"র রূপ বর্ণনা করেছেন দেব-মূর্তিকে সামনে রেখে, তা পৌরাণিক ধ্যান-ধারণারই সার্থক প্রয়োগ। ব্রহ্মার ধ্যান-মন্ত্রেই ব্রহ্মাকে চতুর্মুখ বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই চার মুখ থেকেই চারটি বেদ বিনিঃসৃত। ব্রহ্মাই সৃষ্টিকর্তা এবং আদিতে পরম ব্রহ্ম একাই ছিলেন—এটাই পৌরাণিক ধারণা। বিষ্ণুর ধ্যানমন্ত্রে দেখি তিনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী। অর্থাৎ চার হাত বিশিষ্ট। পৌরাণিক ধারণা অনুযায়ী বিষ্ণু হচ্ছেন গোপা, অর্থাৎ বিশ্বপালক। আর মহাদেবের "প্রলয় রূপ" সে তো আমরা "জটার বাঁধন" খোলার পরই দেখতে পাই, যখন তিনি "প্রলয় নাচন" নাচেন কবির হৃদস্পন্দনের ছন্দে।

রবীন্দ্রনাথ সমগ্র সৃষ্টি-রহস্যের মধ্যেই একটা খামখেয়ালিপনা, একটা পাগলামি আবিষ্কার করেছেন। পাগল শব্দটা ঘৃণাসূচক নয়। কবি বলেছেন: খেপা নিমাইকে আমরা খেপা বলিয়া ভক্তি করি, আমাদের খেপা দেবতা মহেশ্বর। রবীন্দ্রনাথ এই "খেপার" মধ্যেই কখনও ভোলা মহেশ্বরকে যেন দেখেছেন, যেমন দেখেছেন ভোলানাথকে, তেমনি দেখছন নটরাজ শিবকে। নটরাজের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ মূলত দুটি কারণে। প্রথম, নটরাজের মধ্যে সেই চিরকালের পাগলকে তিনি দেখেছেন। দ্বিতীয়ত, নাটক নৃত্যনাট্য সংগীতের স্রষ্টা হিসেবে কবি নটরাজের মধ্যে সৃষ্টি-প্রলয়ের জগতে ক্রিয়াশীল নৃত্যপর শিবকে দেখেছেন।

রবীন্দ্রনাথ এই নটরাজকেই জীবজগতের অধিপতিরূপে কল্পনা করেছেন, কল্পনা করেছেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বররূপে। 'প্রভাত সংগীত' কাব্যের 'মহাস্বপ্ন' কবিতায় তিনি বলেছেন:

> পূর্ণ করি মহাকাল পূর্ণ করি অনন্ত গগন,
> নিদ্রামগ্ন মহাদেব দেখিছেন মহান্ স্বপন।
> বিশাল জগৎ ওই প্রকাণ্ড স্বপন সেই,
> হৃদয়সমুদ্রে তাঁর উঠিতেছে বিম্বের মতন।

নটরাজ মূর্তির মধ্যে প্রলয়ের যে উদ্দামতা স্পষ্ট, তার পিছনে পৌরাণিক কাহিনীটি হচ্ছে: সতীশোক-কাতর মহাদেব এমন তাণ্ডব-নৃত্যে মেতেছিলেন, যাতে সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল সমগ্র বিশ্বজগৎ। সেই রুদ্র-নৃত্যের তালে প্রলয়ের রূপ প্রকাশিত। শিবের ডমরুর তালে এবং কর্ম-সংগীতের ধ্বনিতে মূর্ত হয় প্রণবাত্মক ব্রহ্মসংগীত, আর সেই সংগীতের ছন্দে ছন্দে জেগে ওঠে অপরূপ নৃত্যকলার বৈভব। নৃত্য, গীত ও বাদ্য এই তিনের সহযোগেই নাটক এবং নাট্যশাস্ত্রের আদি প্রবক্তারূপে পুরাণ শিবকেই বরণ করে নিয়েছেন। স্কন্দ পুরাণে নটরাজ শিবের চারমাস ব্যাপী এক নৃত্যাভিনয়ের কথা উল্লিখিত আছে। শুধু নৃত্যে নয়, সংগীতেও শিবের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে শিবের কণ্ঠ-সংগীত শ্রবণে বিষ্ণুর পাদপদ্ম বিগলিত হয়ে

গিয়েছিল এবং ব্রহ্মা সেই বিগলিত পাদপদ্মকে কমণ্ডলুতে ধারণ করেন। এই তরলরূপ-বিষ্ণুচরণই নাকি গঙ্গা।

শিবের এই পৌরাণিক রূপই "নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী" রবীন্দ্রনাথকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। আমরা আগেই দেখেছি যে, স্রষ্টা ও শিল্পী রবীন্দ্রনাথের অন্তর জুড়ে শিবের নটরাজ-প্রতিভা। আমরা দেখেছি, জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ যখন ভাব প্রকাশের অন্যতম মহৎ বাহন হিসাবে দেহছন্দকে খুঁজে পান, যখন নৃত্যমাধুর্যে প্রকাশ করেন জীবন-মাধুর্যকে, তখন যেন তিনি সব থেকে মুগ্ধ ও বিস্মিত শিবের নটরাজ-মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে। "নৃত্যের তালে তালে" তিনি নটরাজের বিচিত্র ভাবপ্রকাশকে প্রত্যক্ষ করেন এবং কল্পনা করেন, মূর্তি-বৈচিত্র্যও প্রত্যক্ষ করেন। বিভিন্ন প্রবন্ধে, রচনায় ও কবিতায় এই মূর্তি-বৈচিত্র্যই বার বার প্রতিভাত।

আবার তিনি বলেন: ভোলানাথ, যিনি আমাদের শাস্ত্রে আনন্দময়, তিনি সকল দেবতার মধ্যে খাপছাড়া। সেই পাগল দিগম্বরকে আমি আজিকার এই ধৌত নীলাকাশের রৌদ্র-প্লাবনের মধ্যে দেখিতেছি। এই নিবিড় মধ্যাহ্নের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে তাহার ডিমি ডিমি ডমরু বাজিতেছে।

উল্লিখিত অংশটি 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থের "পাগল" নামক রচনার খণ্ডাংশ। উক্ত রচনায় কবি পাগল—চিরকালের খ্যাপা পাগল ভোলানাথের উদ্দেশ্যে বলেছেন: ভোলানাথ আমি জানি, তুমি অদ্ভুত। জীবনে ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুত রূপেই তুমি তোমার ভিক্ষার ঝুলি লইয়া দাঁড়াইয়াছ। একেবারে হিসাব-কিতাব নাস্তানাবুদ করিয়া দিয়াছ। তোমার নন্দীভৃঙ্গীর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে।

"জীবনে ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুত রূপে" যিনি এসে বার বার কবির সামনে দাঁড়িয়েছেন, সেই পাগলের উদ্দেশে কবি এবার বলেছেন: হে রুদ্র, তোমার ললাটের যে ধ্বক্ ধ্বক্ অগ্নিশিখার স্ফুলিঙ্গমাত্রে অন্ধকারে গৃহের প্রদীপ জ্বলিয়া ওঠে, সেই শিখাতে লোকালয়ে সহস্রের হাহা-ধ্বনিতে নিশীথরাত্রে গৃহদাহ উপস্থিত হয়। হায়, শম্ভু, তোমার

নৃত্যে তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে সংসারে মহাপুণ্য ; মহাপাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সংসারের উপরে প্রতিদিনের জড় হস্তক্ষেপে যে একটা সামান্যতার একটানা আবরণ পড়িয়া যায়, ভালোমন্দ দুয়েরই প্রবল আঘাতে তুমি তাহাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিতে থাক ও ও প্রাণের প্রবাহকে অপ্রত্যাশিতের উত্তেজনায় ক্রমাগত তরঙ্গিত করিয়া করিয়া শক্তির নব নব লীলা ও সৃষ্টির নব নব মূর্তি প্রকাশ করিয়া তোল। পাগল, তোমার এই রুদ্র আনন্দে যোগ দিতে আমার ভীত হৃদয় যেন পরাঙ্মুখ না হয়। সংহারের রক্ত-আকাশের মাঝখানে তোমার রবিকরোদ্দীপ্ত তৃতীয় নেত্র যেন ধ্রুবজ্যোতিতে আমার অন্তরের অন্তরকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। নৃত্য করো, হে উন্মাদ! নৃত্য করো। সেই নৃত্যের ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষকোটি যোজনব্যাপী উচ্ছলিত নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমান হইতে থাকিবে, তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের আক্ষেপে যেন এই রুদ্র সংগীতের তাল কাটিয়া যায়। হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভাল এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই জয় হউক।

শিব-মহিমা এবং শিবের রূপবৈচিত্র্য যে রবীন্দ্র-অন্তর কতখানি অধিকার করে রেখেছিল, কবির ভাবনা-চিন্তায় শিব যে কতভাবে ও কত রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তা সুস্পষ্ট হয় উপরের উদ্ধৃতি থেকেই। এখানে ব্রাহ্ম-রবীন্দ্রনাথ নয়, একেবারে ধ্যানে ও ধারণায় শৈব রবীন্দ্রনাথই বাস্তব, যিনি শিবের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান : সংহারের রক্ত-আকাশের মাঝখানে তোমার রবিকরোদ্দীপ্ত তৃতীয় নেত্র যেন ধ্রুবজ্যোতিতে আমার অন্তরকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে।

এই প্রসঙ্গে আমরা রবীন্দ্রনাথের "নটরাজ" নাট্যকাব্যের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে পারি, সেখানে তিনি অনুভব করেছেন যে, এই বিশাল বিশ্ব নটরাজেরই নৃত্যছন্দে বাঁধা, নটরাজই বিশ্ব-সংসারের নিয়ামক। মুগ্ধ কবির কণ্ঠে তাই ভক্তিরসাশ্রিত বন্দনাসংগীত উচ্চারিত হয় :

তোমার বিশ্ব নাচের দোলায়
বাঁধন পরায় বাঁধন খোলায়,...

তারপর

তব নৃত্যের প্রাণবেদনায়
বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়,···
সুখে দুখে হয় তরঙ্গময়
তোমার পরমানন্দ।

কবি নটরাজের নৃত্য-ভঙ্গিমায় দর্শন করেন "মুক্তির রূপ", প্রত্যক্ষ করেন, "বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে কাঁপে নৃত্যের ছায়া"। এই নাট্য-কাব্যের ভূমিকায় শিবভক্ত কবি বলেন: নটরাজের তাণ্ডবে তাঁর এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হয়ে প্রকাশ পায়, তাঁর অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হতে থাকে। শিবের এই রূপে বিমোহিত রবীন্দ্রনাথ কত সহজেই "নটরাজের চেলা" হয়ে যান, বলেন:

আমি নটরাজের চেলা
চিত্তাকাশে দেখছি খেলা ;
বাঁধন খোলার শিখছি সাধন
মহাকালের বিপুল নাচে।

শিব-মহিমা অনুসন্ধানেও কবি যেন এক ক্লান্তিহীন পথিক। "জাভাযাত্রীর পত্র" গ্রন্থের ১৬ সংখ্যক পত্রে কবি বলেছেন: শিবমন্দিরই এখানে প্রধান।···শিবকে এদেশে (জাভা) গুরু, মহাগুরু বলে অভিহিত করেছে। আমার বিশ্বাস, বুদ্ধের গুরুপদ শিব অধিকার করেছিলেন, মানুষকে তিনি মুক্তির শিক্ষা দেন। এখানকার শিব নটরাজ, তিনি মহাকাল ; অর্থাৎ সংসারে যে চলার প্রবাহ, জন্মমৃত্যুর যে ওঠাপড়া, সে তাঁরই নাচের ছন্দে। তিনি ভৈরব, কেননা লীলার অঙ্গই হচ্ছে মৃত্যু। আমাদের দেশে এক সময়ে শিবকে দুই ভাগ করে দেখছিল। একদিকে তিনি অনন্ত, তিনি সম্পূর্ণ, সুতরাং তিনি নিষ্ক্রিয়, তিনি প্রশান্ত ; আর একদিকে তাঁরই মধ্যে কালের ধারা তার পরিবর্তন পরম্পরা নিয়ে চলেছে, কিছুই চিরদিন থাকছে না,. এইখানে মহাদেবের তাণ্ডবলীলা কালীর মধ্যে রূপ নিয়েছে।

শিব-মহিমা ব্যাখ্যায় এমন নিষ্ঠাবান মানুষ আমরা আর ক'জনকে পেয়েছি? মহাদেবের তাণ্ডবলীলা যে কালীর মধ্যে রূপ গ্রহণ করেছে—সেটা প্রত্যক্ষ করতেও কিন্তু "ব্রাহ্ম" ও "নিরাকারবাদী" রবীন্দ্র-নাথের মনে কিছুমাত্র সঙ্কোচ দেখা দেয় নি।

রবীন্দ্রনাথের "ভগ্নহৃদয়" কাব্য 'ভারতী' পত্রিকায় বাংলা ১২৮৭ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। প্রায় একই সময়ে (বাংলা ১২৮৭ সালের আশ্বিন) 'ভারতী'তে প্রকাশিত একটি কবিতা, নাম যার "হরহৃদে কালিকা"। এই কবিতাটি সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা করার সুযোগ বর্তমান। এখানে শুধু উক্ত কবিতাটির সংগে 'প্রভাত সংগীত' কাব্যগ্রন্থের যে কবিতাটির কথা আগেই বলেছি সেই "সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়" কবিতাটিকে ভাবসূত্রে যুক্ত করে দেখাতে চাই যে, মহাদেবের প্রলয়রূপ, নটরাজ-রুদ্রের পিনাক্-টংকার রবীন্দ্র-চেতনাকে একবার নয়, বিচ্ছিন্ন ভাবে নয়, আকস্মিক ভাবে নয়, বার বার আপ্লুত করেছে। "হরহৃদে কালিকা"য় কবি বলেছেন: একদা প্রলয় শিঙ্গা বাজিয়া রে উঠিবে!/ অমনি নিভিবে রবি, অমনি মিলাবে তারা,/ অমনি এ জগতের রাশরজ্জু টুটিবে। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রভাবনার জগতে "বৈষ্ণবের মধুর বংশীধ্বনি ও নটরাজ রুদ্রের পিনাক-টংকার" একই সঙ্গে "লালিত্যে ও শক্তিতে" অপরূপ রূপ পরিগ্রহ করেছে। এখানে নিরাকার ব্রহ্মের অদৃশ্য ধারণা তেমন কোন ছায়া ফেলতে পারে নি, যেমন স্পষ্ট প্রভাব ফেলেছে সনাতন দেব-দেবীর নিয়ত আসা-যাওয়া। আর এই দেবদেবীদের মধ্যে রবীন্দ্র-মননালোকে সব থেকে দীপ্ত ভূমিকা গ্রহণ করেছেন মহাদেব। সেদিক থেকে বিচার করলে স্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব বা শৈব চেতনার মধ্যে সর্বাধিক আচ্ছন্ন শৈব ভাবনায়।

প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের আদি কবি কিড্‌মনের পদ্য-বাইবেল থেকে কয়েকটি অংশ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। এই অনুবাদ-কর্মেও আমরা লক্ষ্য করি ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে মহাদেবের

উপস্থিতি। 'রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা (১)' গ্রন্থের ১২২-২৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত এই অনুবাদকৃত পদ্যের কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করি :

পৃথিবী তরুণ তৃণে ছিল না হরিৎ—
সমুদ্র চিরান্ধকারে আছিল আবৃত—
পথ ছিল সুন্দর—বিস্তৃত অন্ধকার !
আদেশিল মহাদেব জ্যোতিরা আসিতে
এ মহা আঁধার স্থানে। মুহূর্তে অমনি
ইচ্ছা পূর্ণ হোল তাঁর। পবিত্র আলোক
এই মরুময় স্থানে পাইল প্রকাশ।

শিবপুরাণে বর্ণিত "শিব" শব্দের বর্ণনানুসারিণী ব্যাখ্যা হচ্ছে : শ+ই+ব=শিব। শ ই ব—এই তিনটি বর্ণের সমন্বয়েই 'শিব' শব্দের উৎপত্তি। 'শ'কার শব্দের অর্থ নিত্য সুখ ও আনন্দ, 'ই'কার সূচিত করে পুরুষ এবং 'ব'কার-এর অর্থ অমৃত শক্তি—"বকারঃ শক্তিরমৃতঃ"। শিবের মধ্যেই আমরা যেমন সংহারমূর্তিকে দেখি, তেমনি দেখি অমৃত শক্তির আধার মৃত্যুঞ্জয়কে। পুরাণের মৃত্যুঞ্জয় একদিকে নীলকণ্ঠ, অন্যদিকে মৃত্যুঞ্জয়—যিনি দুঃখকে আত্মসাৎ করেন, মৃত্যুকে জয় করেন। রবীন্দ্রনাথ এই মৃত্যুঞ্জয় রূপী শিবের আরাধনা করতে গিয়েই যেন বলেছেন : দুঃখকে আমাদের সহায় করিতে হইবে। তবে মৃত্যুঞ্জয় আমাদের সহায় হইবেন। কবি 'আলোচনা' শীর্ষক গ্রন্থের "কর্ম : একটি রূপক" প্রবন্ধে বলেছেন : মরণের রঙ্গভূমি শ্মশানের মধ্যে তাঁহার বাস, তবু নৃত্য। মৃত্যু-স্বরূপিণী কালী তাঁহার বক্ষের উপর সর্বদা বিচরণ করিতেছেন, তবু তাঁহার আনন্দের বিরাম নাই।

আমরা আলোচনা সূত্রেই দেখব যে, শিবের বিভিন্ন রূপ রবীন্দ্র-মানসলোকে কেমন স্বচ্ছ ছায়া ফেলেছে। নটরাজ, রুদ্র, মৃত্যুঞ্জয়, নীলকণ্ঠ বা ভোলানাথ যেমন তাঁর হৃদয়ের আসনকে বারে ও বারান্তরে দখল করেছে, তেমনি দখল করেছে মহাকাল।

কে এই মহাকাল? রুদ্রেরই এক নাম ভৈরব বা কালভৈরব।

রবীন্দ্রনাথ এই ভৈরব উদ্দেশেই প্রার্থনা জানিয়েছেন: হে ভৈরব, শক্তি দাও। এই ভৈরবই আবার ভিন্নতর পরিপ্রেক্ষিতে মহাকাল—যিনি রবীন্দ্রমননালোকে সুপ্রতিষ্ঠিত। 'ভারত পথিক' রবীন্দ্রনাথ যেমন শিবময়, তেমনি এই ভারতবর্ষও শিবময়। যিনি বারাণসীতে মহাদেব, প্রয়াগে মহেশ্বর, ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজ, গয়াতে প্রপিতামহ, তিনিই হিমালয়ে রুদ্র, ভৈরবে ভৈরবাকার, কনখলে উগ্র, রুদ্রকোটিতে মহাযোগী এবং অবন্তীতে মহাকাল। শিবমাহাত্ম্য এত ব্যাপ্ত ও গভীর কেন? কেন ভারতবর্ষময় শিবের অধিষ্ঠান? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের শিব-রূপের স্বাতন্ত্র্য ও অনন্যসাধারণতার কথা স্মরণ করতে হয়। শিব একই সঙ্গে ত্যাগীর আদর্শ, আবার গৃহীরও আদর্শ। শিবই আবার যোগী বা ভক্ত বা জ্ঞানীর পথনির্দেশক। একটু উদার ও প্রসারিত চিন্তা ও চেতনা দিয়ে যদি বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখতে পাব, শিব কোন বিশেষ সম্প্রদায় বা ধর্মের নয়, শিব সর্বকালের এবং সর্বজনের আদর্শ, আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির মূর্ত বিগ্রহ।

মহাদেব যখন মঙ্গলবিধায়ক তখন তিনি শিব, যখন তিনি ধূম্ররূপী তখন তিনি ধূর্জটি, যখন তিনি বিশ্বের সমুদয় বিষ অর্থাৎ পাপ ও গ্লানি স্বয়ং গ্রহণ করেন, তখন তিনি নীলকণ্ঠ, যখন তিনি সর্বভূতের শং বা মুক্তি বিধান করেন তখন তিনি শংকর, আর যখন তিনি কল্পে কল্পে স্বীয় লীলামহিমায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লয় সাধন করেন, তখন তিনি মহাকাল। আবার এই যে অনন্ত ও অসীম কালপ্রবাহ, যার শুরু নেই, শেষ নেই, তিনিই তো মহাকাল। "তপোভঙ্গ" কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এই মহাকালকেই 'কালের অধীশ্বর' বা 'কালের রাখাল' বলে অভিহিত করেছেন। সেইজন্য পুরাণের মহাকাল রুদ্ররূপে ভিন্নরূপ হলেও তাঁর একটা বিশেষ ভূমিকা, মহিমা ও তাৎপর্য আছে—যা রবীন্দ্রচেতনাকে উদ্দীপ্ত করেছে বারবার।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে এই যে 'কালের অধীশ্বর' মহাকাল, তিনিই হলেন নিরপেক্ষ বিচারক। সেই 'কালের রাখাল-রূপী' মহাকালের

হাতেই বিচারের অমোঘ ন্যায়দণ্ড। অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে যখন কবি প্রতিবাদ জানান, যখন প্রতিরোধের সংকল্প ঘোষণা করেন, তখন একমাত্র সহায় ও অবলম্বন হিসেবে তিনি 'ভৈরব', 'রুদ্র' বা 'মহাকাল'কে আহ্বান জানান, বলেন: 'হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা। এই একই অভ্রান্ত ভাবনা সুস্পষ্ট 'প্রান্তিক' কাব্যের একটি কবিতায়। "একালের আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা" তাঁকে বিচলিত করে তোলে, তিনি কম্বুকণ্ঠে প্রার্থনা জানান:

মহাকাল সিংহাসনে
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনি বজ্রবাণী।

আবার 'পরিশেষ' কাব্যের "মোহানা" কবিতায় কবি বলেন: কালীরে রহে বক্ষে ধরি শুভ্র মহাকাল./ বাঁধে না তারে কালো কলুষ জাল।' কবি কালীপূজার রাত্রে (বাং ১৩৩৪, ৭ই কার্তিক) যেন আদি-অন্তহীন কালরূপা মহাকালীকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

মহাকাল যেন কবির কাছে 'অচঞ্চল দেশ' এবং এক বিশেষ বাদল-দিনের বর্ণনায় এই মহাকালেরই বিশাল অচঞ্চল রূপটি যেন কবিকে আচ্ছন্ন করে। 'পথে ও পথের প্রান্তে' গ্রন্থের ৩৮ অধ্যায়ে কবি বলেছেন: বাদলার দিন মেঘদূতের দিন নয়, এ যে অচলতার দিন—চঞ্চল কালের প্রবল রূপ দেখছিনে বটে, কিন্তু অচঞ্চল দেশের বৃহৎ রূপ দেখা যাচ্ছে। শ্যামাকে দেখলুম না, কিন্তু শিবের দর্শন মিলল।'

কবি তাঁর সমস্ত চৈতন্যকে সতেজ ও সজীব করে যে শিবকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন বার বার, সেই শিব নটরাজ, সেই শিব রুদ্র, সেই শিব মহাকাল, আবার সেই শিব ভোলানাথ। কবি শিবের উদ্দেশে বলেন: 'হে শুষ্ক বল্কলধারী বৈরাগী'; আবার শিবকে বলেন: হে ভৈরব, শক্তি দাও। শিবময় চেতনায় আপ্লুত কবি যেন পরম তৃপ্তিতে বলেন: শ্যামাকে দেখলুম না, কিন্তু শিবের দর্শন মিলল। শিবভক্ত রবীন্দ্রনাথ মূর্তি কল্পনায় যেমন অসাধারণ, তেমনি সেই মূর্তির স্বরূপ দর্শনে তৃপ্ত।

বিশ্বকর্মা এবং ইন্দ্র ঃ রবীন্দ্রনাথের চোখে

ইন্দ্র ও বিশ্বকর্মার মধ্যে সাদৃশ্য বর্তমান—তাই দুজনকেই একসঙ্গে বরণ করেছি। দুজনেই দেবতা, দুজনেই সুপুরুষ, এবং দুজনেই দেবতা হয়েও মানব-গুণাবলীতে প্রদীপ্ত। অর্থাৎ, দুজনেরই নিজস্ব কর্মক্ষেত্র বর্তমান, কিছু দায়িত্বপালনের দায় দুজনকেই বহন করতে হয়। একজন দেবরাজ, আরেকজন দেব-কারিগর। গণতন্ত্রের যুগে রাজা না থাকলেও রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী আছেন, আর ইঞ্জিনিয়াররা তো আছেনই।

বিশ্বকর্মা সৃষ্টিকর্তা, তিনি "রাজা-কারিগর"। 'রাশিয়ার চিঠি'র সাত সংখ্যক পত্রে আমরা দেখি, রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০ সালে রাশিয়ার কর্মোদ্যোগী ছাত্রসমাজকে লক্ষ্য করে বলছেন: এরা "বিশ্বকর্মা"; অতএব, এদের বিশ্বমনা হওয়া চাই। অতএব এদের জন্যই যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয়। কবিগুরু "বিশ্বকর্মা" কথাটিকে একটা ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করেছেন, পৌরাণিক "বিশ্বকর্মা"কে আধুনিক মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাই আমরা দেখি, কবির চোখে আধুনিক বিজ্ঞানও যেন বিশ্বকর্মা—যে কিনা মানবকল্যাণের সৃষ্টিযজ্ঞে আত্মমগ্ন। 'জাভাযাত্রীর পত্রে' (পত্র—১) তিনি বলছেন: মানুষের অমরাবতী নির্মাণের বিশ্বকর্মা এই বিজ্ঞান।

আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করি যে, পুরাণের বিশ্বকর্মাকে রবীন্দ্রনাথ কত বড় ও কত ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিশ্বকর্মা দেবতা-দের কারিগর—এ ছাড়া অন্য কোন পরিচয় বা মহিমা পৌরাণিক বয়ানে তাঁর নেই। প্রথমদিকে কবিগুরুও বিশ্বকর্মাকে নিছক বিশ্বনির্মাতারূপেই যেন দেখেছিলেন। তিনি 'চারিত্রপূজা' গ্রন্থে "বিদ্যাসাগর চরিত" প্রবন্ধে বিশ্বকর্মাকে সীমাবদ্ধ অর্থেই বরণ করে-ছিলেন, কিন্তু পরে 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের "গদ্য ও পদ্য" প্রবন্ধে তিনি

ব্যাপক অর্থে প্রত্যেক মানুষের অন্তরেই একজন সৃষ্টি-নিপুণ বিশ্বকর্মার অস্তিত্বকে যেন আবিষ্কার করেছেন। "গদ্য ও পদ্য" প্রবন্ধে তিনি বলেছেন: আমাদের মধ্যে যে বিশ্বকর্মা আছেন, যিনি আমাদের অন্তরের নিভৃত সৃজনকক্ষে বসিয়া নানা গঠন, নানা বিন্যাস, নানা প্রয়াস, নানা প্রকাশ—চেষ্টায় সর্বদা নিযুক্ত আছেন, পদ্যে তাঁহারই নিপুণ হস্তের কারুকার্য অধিক।

বৃহৎ ও ব্যাপক অর্থে বিশ্বকর্মার মহিমাকে প্রতিষ্ঠা করার এই যে প্রয়াস—এটা কবিগুরুর নিজস্ব ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি। তাই আমরা 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থের "মাভৈ ও পনের আনা" প্রবন্ধে বা 'সাহিত্য' গ্রন্থের "সাহিত্য পরিষৎ" প্রবন্ধে তিনি যে প্রচলিত অর্থে বিশ্বকর্মাকে দেখেছিলেন, 'শান্তিনিকেতন (১)' গ্রন্থের "বিমুখতা" প্রবন্ধে সেই দুটি ভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। এখানে পুরাণের দেব-কারিগর এক নতুন মহিমায় ঔপনিষদিক বিশ্ববিধাতায় রূপান্তরিত। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বিশ্বকর্মা "সদাজনানং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ" (৪/১৭); তাঁর কর্মক্ষেত্র শুধু প্রাসাদ নির্মাণ, রাজধানী নির্মাণ বা দেবতাদের অস্ত্র নির্মাণেই সীমাবদ্ধ নয়, তাঁর কর্মক্ষেত্র বাহ্যলোক থেকে প্রসারিত মানুষের অন্তরলোকেও, তিনি হৃদয়ের অধিপতি। রবীন্দ্রনাথ বলছেন: বিশ্বকর্মা যে তোমার চৈতন্যাকাশকে এই মুহূর্তে একেবারে অরুণরাগে প্লাবিত করে দিলেন। চেয়ে দেখো তোমারই অন্তরে তরুণ সূর্য সোনার পদ্মের কুঁড়ির মত মাথা তুলে উঠছে, একটু একটু করে জ্যোতির পাপড়ি চারিদিকে ছড়িয়ে দেবার উপক্রম করছে—তোমারই অন্তরে। এই তো বিশ্বকর্মার আনন্দ।

আমরা যদি রবীন্দ্রনাথের 'খৃষ্ট' গ্রন্থের "খৃষ্টোৎসব" প্রবন্ধ, 'জাভাযাত্রীর পত্রে'র পাঁচ সংখ্যক পত্র বা 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থের "সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা" প্রবন্ধ একাগ্রচিত্তে অনুসরণের জন্য লক্ষ্য করি, তাহলে দেখব, কবিগুরু দেব-কারিগরকে দেবতার সংসার থেকে মুক্ত করে এনে বিশ্ববিধাতার সিংহাসনে কত যত্নে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থের ৪ অধ্যায় বা 'ভানু সিংহের

পত্রাবলী'র ২১ সংখ্যক পত্রটির কথাও স্মরণ করতে পারি—যেখানে দেখব, কবি বিশ্বকর্মাকে কর্মের অঙ্গন থেকে তুলে এনে স্রষ্টার বেশে সাজিয়েছেন, গড়ে তুলেছেন বাহির ও অন্তরের বিধাতাকে। কবির "মহামানব" কল্পনা যেন বিশ্বকর্মার মধ্যেই মূর্ত। রবীন্দ্রনাথ হেমন্তবালা দেবীকে এক পত্রে (চিঠিপত্র—৯, পত্র—২০) লিখেছেন : এই দেবতার অধিষ্ঠান সকল মানুষের হৃদয়ে, বিশ্বের সকল মানুষের কর্মেই তিনি বিশ্বকর্মা।

আবার রসপিপাসু কবি বিশ্বকর্মাকে নিয়ে কৌতুক করতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হননি। 'জাভাযাত্রীর পত্রে' (পত্র—২০) তিনি যাত্রাপথে সমুদ্রবক্ষে দেখা কতগুলি দ্বীপের দিকে তাকিয়ে বলছেন : এই জায়গাটাতে বিশ্বকর্মার মাটির ব্যাগ ছিঁড়ে অনেকগুলো ছোটো ছোটো দ্বীপ সমুদ্রের মধ্যে ছিটকে পড়েছে।

রাজা-কারিগরের পাশাপাশি আমরা রবীন্দ্র-ধারায় দেবরাজের মূর্তিটিও দেখে নিতে পারি। দেবরাজ ইন্দ্র একদিকে যেমন ঋষির ধ্যানভঙ্গকারী, অন্যদিকে তেমনি বর্ষণের দেবতা। তাঁরই বাহন ঐরাবত—উচ্চৈঃশ্রবা, যা কবির দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করেছে বারবার। 'ভানু সিংহের পত্রাবলী'তে (পত্র—১০) বালিকা রাণুর কাছে কবি একান্ত অন্তরঙ্গ সুরে মেঘমেদুর আকাশের বর্ণনা দিয়ে বলেন : ইন্দ্রের ঐরাবতের বাচ্চাগুলোর মতো মোটা মোটা কালো মেঘ আকাশময় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবার কবি প্রমথ চৌধুরীকে পত্র লেখেন (চিঠিপত্র—৫, পত্র—৯৩) : মাঝে মাঝে যখন তখন তোমার একলার লেখাঙ্কিত উড়ো কাজ এক এক পসলা বর্ষণ করে দিতে দোষ কি ? .... ইন্দ্রদেব একাজ করে থাকেন।

রবীন্দ্র-রচনায় দেবরাজ ইন্দ্রের উপস্থিতি বারবার, তবে তুলনা-মূলকভাবে কবির চোখে দেবরাজের গুরুত্ব যেন বেশ কিছুটা ম্রিয়মাণ। অর্থাৎ, তিনি যেভাবে ও যে দৃষ্টিতে রাজা-কারিগরকে মহিমান্বিত করেছেন, তেমনভাবে ইন্দ্র তাঁকে মুগ্ধ করতে পারেনি। বিশেষ করে তিনি যেন তপোভঙ্গকারীরূপেই ইন্দ্রকে বেশীমাত্রায় সনাক্ত করেছেন।

ইউরোপ যাত্রীর ডায়ারীতে তিনি লিখেছেন : পুরাণে পড়া যায় ইন্দ্রের একটি প্রধান কাজ হচ্ছে······যিনি তপস্যা করেন, অপ্সরী পাঠিয়ে তার তপস্যা ভঙ্গ করা। আমার বোধহয় সেই পরশ্রীকাতর ইন্দ্র আমার বন্ধুর বুদ্ধিবৃত্তিকে সর্বদাই বিক্ষিপ্ত করে রাখবার অভিপ্রায়ে তার কোনো সুচতুরা কিন্নরীকে তামাকের থলিরূপে আমার বন্ধুর পকেটের মধ্যে প্রেরণ করেছেন।

'সমূহ' গ্রন্থের "পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী" শীর্ষক রাজনৈতিক প্রবন্ধে কবি অপূর্ব নিপুণতায় হিন্দু-মুসলমানের বিরোধকে ইন্দ্রের তপোভঙ্গকারী দূতরূপে কল্পনা করেছেন। প্রায় কাছাকাছি সময়ে 'সাহিত্য' গ্রন্থে "সৌন্দর্য ও সাহিত্য" প্রবন্ধে কবি একই প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। কবি মীরা দেবীকে লেখা এক পত্রে বলেন (চিঠিপত্র—৪, পত্র ৪২) : পৃথিবী যে অমরাবতী নয়, সেই কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য দেব-রাজ ইন্দ্র এখানকার সমস্ত আসবাবেই ছারপোকার বসতি স্থাপন করিয়েছেন।

কবিগুরু ইন্দ্রের তপোভঙ্গকারী রূপকে এক বিচিত্র রূপ-কল্পনায় যেন জীবন্ত করে তুলেছেন—যা সম্ভবত এবং শুধুমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব। "পুরবী" কাব্যগ্রন্থের "তপোভঙ্গ" কবিতাটি স্মর্তব্য। কবি বলছেন : তপোভঙ্গদূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী স্বর্গের চক্রান্ত আমি।

আবার আমরা, 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের "সৃষ্টি" শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের এক অপূর্ব ব্যাখ্যা দেখি : ধর্মশাস্ত্রে বলে ইন্দ্রদেব কঠোর সাধনার ফল নষ্ট করবার জন্যেই মধুরকে পাঠিয়ে দেন। আমি দেবতার এই ঈর্ষা, এই প্রবঞ্চনা বিশ্বাস করিনে। সিদ্ধির পরিপূর্ণ অখণ্ড মূর্তিটি যে কি রকম তাই দেখিয়ে দেবার জন্যেই ইন্দ্র মধুরকে পাঠিয়ে দেন······মেনকা উর্ব্বশী এরা হল পরিপূর্ণতার অখণ্ড প্রতিমা।

দেবমহিমার প্রতি এমন অবিচল বিশ্বাস এবং এমন একাগ্র আস্থা কি কোন অপৌত্তলিকের ধ্যানে ও ধারণায় স্থান পায় ? সনাতন

ভারতবর্ষের রূপরসগন্ধ নিয়ে যে রবীন্দ্রনাথ যথার্থ অর্থে রবীন্দ্রনাথ হয়েছেন, তিনি কি সনাতন রূপকল্পনার জগত থেকে নির্বাসিত থাকতে পারেন? তাই "অপৌত্তলিক" রবীন্দ্রনাথ দেবমূর্তির মধ্যে খুঁজে পান জীবনরহস্যের সন্ধান।

কার্তিকেয় ও গণেশঃ রবীন্দ্রভাবনা

দেবী দুর্গা বা পার্বতী যখন বৎসরান্তে চারদিনের জন্য মর্ত্যে আসেন, তখন সঙ্গে নিয়ে আসেন তাঁর দুই কন্যা এবং দুই পুত্রকে। দুই পুত্রের একজন দেবসেনাপতি কার্তিকেয় আর অপরজন সিদ্ধিদাতা গণেশ। কার্তিকেয় গণেশের অনুজ। কার্তিকেয় বৈদিক যুগের দেবতা কিনা, তা নিয়ে এখনও তর্কের অবসান হয়নি। তবে কালক্রমে বৈদিক রুদ্র এবং দেবরাজ ইন্দ্রের তেজ ও শক্তির মিলনে দেবকুলে যে এক নতুন দেবতার আবির্ভাব ঘটেছিল, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। এই নতুন দেবতাই দেবসেনাপতি কার্তিকেয়। যিনি সৌন্দর্য ও বীর্যের সমন্বয়ে যুবশক্তির প্রতীক। ভবিষ্যপুরাণে দেখি, স্কন্দ কার্তিকেয় সূর্যের সহচর।

কার্তিকেয়ের বাহন ময়ূর। তাঁর দেহের রঙ সোনার মত। দুই হাত। ছয়টি মুখ। আর তিনি মানুষকে সন্তান দান করেন। কার্তিকেয়ের ধ্যানমন্ত্র থেকে আমরা এই পরিচয়ই পাই। আমরা জানি মহাকবি কালিদাসের মহাকাব্য "কুমারসম্ভব" কার্তিকেয়ের জন্মবৃত্তান্তকেই কাব্যসুষমায় এবং মহৎ সৃষ্টির উন্মাদনায় ধারণ করে রেখেছে। দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করার পর মহাদেব বিশ্ব লয় করতে উদ্যত হলে সতীদেহ খণ্ডবিখণ্ড হয়। তারপর সতীবিরহকাতর ভোলানাথ যোগসাধনায় মগ্ন হয়ে আছেন। আর পতিনিন্দায় কাতর হয়ে পিতৃগৃহে দেহত্যাগ করার পর সতী নতুনরূপে পার্বতী নামে আবার মহাদেবের সহধর্মিণী হতে, আবার লীলাসহচরী হতে জন্মগ্রহণ

করেছেন। দেবতারা শিব-পার্বতীর সেই অবধারিত ও অনিবার্য মিলন ঘটাতে কামদেব মদনের শরণ নিলেন। তপস্যামগ্ন শিবের সামনে মিলনপিয়াসী পার্বতী এলেন সখীদের নিয়ে। তিনি তাঁর জন্মজন্মান্তরের পতি মহাদেবকেই বরণ করতে চান। চিরকালের সতী এখন নগদুহিতা পার্বতী।

কিন্তু মহাদেব যোগাসনে বসে বাহ্যজ্ঞানহারা। তিনি পার্বতীর উপস্থিতি খেয়ালই করলেন না। সেই সময়েই মদনের পঞ্চশরে শিবের সাধনা ভেঙে গেল, চোখ মেলে তাকিয়েই তিনি দেখলেন পার্বতীকে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুঝলেন, তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করার জন্য দায়ী মদন। তখনই শিবের তৃতীয় নয়ন থেকে আগুন বেরোতে লাগল। আর সেই আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেলেন মদন। তাই শিব মদন-বিজয়ী, কামজয়ী। এই ঘটনা দেখে মহাতাপস শিবকে স্বামীরূপে পেতে পার্বতীও হলেন তাপসী। অবশেষে কঠোর সাধনার পর পার্বতীর তপস্যা পূর্ণ হল। পার্বতীর পিতা নগরাজ হিমালয় হরগৌরীর মিলন ঘটালেন, পার্বতীকে বিয়ে দিলেন শিবের সঙ্গে। আর তারপরই জন্ম হল কার্তিকেয়ের। এই মহামিলনের ফলে যে অপরূপ সন্তানের জন্ম হল, সে সন্তান অনন্যসাধারণ।

কার্তিকেয় নাম হল কেন ? জন্মের পর ছয়জন কৃত্তিকা কার্তিকেয়কে লালনপালন করেছিলেন, স্তন্যদান করেছিলেন। সেইজন্যই নাম কার্তিকেয়। কিন্তু শুধু একটা নামই নয়। অনেক নাম। ছয় মুখে তিনি স্তন্যপান করেছিলেন বলেই তাঁর নাম ষড়ানন। মহাদেবের তেজঃ স্কন্ন বা ক্ষরিত হওয়ায় তাঁর জন্ম হয়েছিল বলে তার নাম স্কন্দ। আবার হিমালয়ের গুহায় বাস বলে তাঁর আরেক নাম গুহ। কুটিলার পুত্ররূপে তাঁর নাম কুমার, হুতাশনের পুত্ররূপে তাঁর নাম মহাসেন।

কার্তিকেয় অবিবাহিত ও চিরকুমার এরকম একটা ধারণা আমাদের লৌকিক জীবনে বিশেষ ভাবে বিরাজ করছে। অথচ এই ধারণাটা পৌরাণিক মতে সঠিক নয়। তারকাসুর বধ করার আগে পর্যন্ত তিনি কুমার ছিলেন, তারপর তিনি বিয়ে করেন দেবসেনাকে।

তাঁদের একটি পুত্রও হয়, নাম বিশাখা। কোন কোন পুরাণের মতে এই দেবসেনাই হচ্ছেন মা ষষ্ঠী।

কার্তিকেয় হচ্ছেন দেবতাদের যুবশক্তির মূর্ত প্রতিনিধি। বাবু কার্তিকেয় নয়, মহাবীর ও বীর্যবান কার্তিকেয়ই আমাদের সনাতন ধারণাসঞ্জাত দেবতা, যিনি দেবতাদের স্বাধীনতা রক্ষায় আজন্ম সংগ্রামী। তারক নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত অসুরের কবল থেকে তিনি স্বর্গরাজ্যকে উদ্ধার করেন। শুধুমাত্র বন্ধ্যা বা পুত্রহীনা নারীরাই কার্তিকেয়ের পূজা করবেন তেমন নয়। সুপুত্রের কামনায় সকল মা কার্তিকেয়ের ব্রতপালন করতে পারেন। কার্তিকেয় হচ্ছেন সৌন্দর্য ও বীর্যের প্রতীক। সেই জন্যই সৌন্দর্যমণ্ডিত ময়ূর কার্তিকেয়ের বাহন।

কবি রবীন্দ্রনাথও কার্তিকেয়ের সেই বীর্য ও সৌন্দর্যময় রূপের দিকেই আকৃষ্ট হয়েছেন, তিনি পৌরুষ ও কমনীয়তার সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা কার্তিকেয়কেই সাদরে বরণ করেছেন, বর্জন করতে বলেছেন বীর্যহীন "বাবু" কার্তিকেয়কে। 'ছন্দ' গ্রন্থে "গদ্যছন্দ" শীর্ষক আলোচনায় (পত্রধারা তৃতীয় পর্যায়) তিনি গদ্য কবিতার স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কার্তিকেয়ের উপমাকে উপস্থাপিত করেছেন। বলেছেন, দেবসেনাপতি কার্তিকেয় যদি কেবল স্বর্গীয় পালোয়ানের আদর্শ হতেন, তাহলে শুম্ভ নিশুম্ভের চেয়ে উপরে উঠতে পারতেন না; কিন্তু তাঁর পৌরুষ যখন কমনীয়তার সঙ্গে মিশ্রিত হয়, তখনই তিনি দেবসাহিত্যে গদ্যকাব্যের সিংহাসনের উপযুক্ত হন। দোহাই তোমার, বাংলাদেশের ময়ূরে চড়া কার্তিকটিকে সম্পূর্ণ ভোলবার চেষ্টা করো।

কার্তিকেয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরও কোথাও কিছু মন্তব্য করেছেন কি না জানা নেই। তবে তুলনামূলক বিচারে কার্তিকেয়ের চাইতে গণেশ রবীন্দ্রধ্যান ও চিন্তায় অনেক বেশী ব্যাপ্ত ও স্পষ্ট।

ঋক্‌বেদে বৃহস্পতি ও ব্রহ্মণস্পতিকেই গণপতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গণ শব্দের অর্থ হল জনসমষ্টি এবং সেই গণের যিনি নায়ক, তিনিই গণপতি বা গণেশ। ঋক্‌বেদে (২।২৩।১) বলা হয়েছে:

"গণানাং ত্বাং গণপতিং হবামহে।" যিনি গণপতি, তিনিই গণেশ। বেদের গণপতিই পুরাণে গণেশ। গণেশ কার্তিকেয়ের অগ্রজ বলেই গণেশের আরেক নাম গুহাগ্রজ। পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে গণেশের দ্বাদশ নামের উল্লেখ আমরা পাই। আবার বৃহৎ ধর্মপুরাণে পাই গণেশের ৫০টি নাম। তিনি সিদ্ধিদাতা, আবার তিনিই অজ্ঞানের বিনাশ করেন, মানুষকে মোহ থেকে মুক্ত করেন।

গণেশের মূর্তিকল্পনা আমরা ধ্যানমন্ত্রে দেখতে পাই। সেই মন্ত্রে বলা হয়েছে, গণেশ খর্ব ও স্থূলদেহী। তিনি গজেন্দ্রবদন এবং তাঁর দেহ সিন্দুরবরণ। গণেশপুরাণে বলা হয়েছে: গণেশই ওঁকাররূপী ভগবান। তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ এবং স্বর্বদেবতার অগ্রগণ্য গণাধিনায়ক। বিভিন্ন পুরাণে আমরা গণেশের জন্মবৃত্তান্ত ও গণেশ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন কাহিনী ও ইতিবৃত্ত পাই। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বলা হয়েছে, পার্বতীর কোন পুত্র না হওয়াতে শিবের নির্দেশে তিনি বিষ্ণুর আরাধনা করেন এবং তারই ফলে বিষ্ণুর বরে ও বিষ্ণুর অংশে গণেশের জন্ম হয়। বামনপুরাণের মত অনুযায়ী উমা স্বীয় দেহ থেকেই গণেশের সৃষ্টি করেন এবং নায়ক ব্যতীত তাঁর জন্ম হয়েছিল বলেই গণেশের আরেক নাম বিনায়ক। আবার বরাহপুরাণে বলা হয়েছে যে, গণেশের জন্ম মহাদেবের মুখ থেকে। সেই জন্যই তিনি বাক্যের দেবতা বা বাচস্পতি। মহাদেবের অভিশাপেই গণেশ হলেন হস্তীমুখ এবং লম্বোদর। আবার মহাদেবের নির্দেশেই সকল দেবতার আগেই গণেশের পূজা করতে হয়।

তবে বরাহপুরাণের কাহিনীটি ততটা প্রচলিত নয়, যতটা প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বর্ণিত কাহিনীটি। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের কাহিনী অনুযায়ী, নবজাতক গণেশকে শনি দেখতে চাননি। কিন্তু সেখানে সমবেত সকলের অনুরোধে শনির দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ড ঘাড় থেকে খসে পড়ে। তখন সেই মুণ্ডহীন গণেশকে রক্ষা করতে বিষ্ণু পুষ্পভদ্রা নদীর তীরে ঘুমন্ত এক হাতীর মাথা সুদর্শন চক্র দিয়ে ছিন্ন করে সেই মাথা গণেশের ঘাড়ে বসিয়ে দেন। তাতে গণেশ

পুনর্জীবন লাভ করলেন ঠিকই, কিন্তু গজানন হয়েই বেঁচে রইলেন। যে হাতীর মাথাটি গণেশের দেহে যুক্ত হল, সেই হাতীটি হচ্ছে ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত। বিষ্ণুর বরে গণেশের জন্ম, আবার বিষ্ণুর কৌশলেই গণেশের এই নব কলেবর। অবশ্য গণেশের এই নবরূপ গণেশকে এক বিশিষ্ট মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আমরা যেমন দেখছি গণেশ হচ্ছেন গণপতি (গণ+ঈশ), তেমনি গণ শব্দটির আরেকটি অর্থ সেনাবাহিনী। গণেশ যোদ্ধাও। একবার বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম হরগৌরীকে দর্শন করতে কৈলাসে আসেন। তিনি এসে শোনেন, শিবদুর্গা ঘুমিয়ে আছেন। ঘরের দরজায় পাহারা দিচ্ছেন গণেশ। পরশুরাম ভিতরে যেতে চাইলেন, গণেশ তাতে বাধা দিলেন। তিনি ক্ষাত্রবীর, গণেশকে অগ্রাহ্য করেই ভিতরে ঢুকতে উদ্যত হলেন এবং তারই ফলে গণেশের সঙ্গে রীতিমত লড়াই। সে সময়ে পরশুরাম স্বীয় কুড়াল দিয়ে গণেশের একটি দাঁত ভেঙে দেন এবং গণেশ হলেন একদন্ত। দুজনের এই প্রচণ্ড লড়াইয়ে শিব ও দুর্গার ঘুম ভেঙে গেল। তাঁরা এসে দেখেন : শিবের শিষ্য পরশুরাম এবং শিবের পুত্র একদন্ত গজানন। এই দৃশ্য দেখে মহাদেব পরশুরামকে ক্ষমা করলেন ঠিকই কিন্তু দেবী হলেন ক্রুদ্ধা। তখন নিরুপায় পরশুরাম বিষ্ণুর শরণ নিয়ে আত্মরক্ষা করলেন।

গণেশ বীর্যবান, কর্তব্যপরায়ণ, পিতৃমাতৃভক্ত, চরিত্রবান এবং সংযমী। তুলসী হলেন ধর্মধ্বজের কন্যা এবং তিনি গণেশকে বিয়ে করতে চাইলেন। কিন্তু গণেশ তুলসীকে প্রত্যাখ্যান করেন। দেখান স্বীয় চরিত্রের দৃঢ়তা। সেই জন্যই গণেশ পূজায় তুলসী লাগে না। অবশ্য শেষ পর্যন্ত গণেশ দেববালা পুষ্টিকে বিয়ে করেন।

আদিতে গণেশ ছিলেন বিঘ্নের দেবতা, পরে তিনিই হন বিঘ্ন-বিনাশের দেবতা। তাই তাঁর নাম বিঘ্নেশ। আবার তিনিই কবিদের মধ্যে প্রধান কবি, তিনি জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ। মহাভারতই গণেশের জ্ঞান ও কাব্যপ্রতিভার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মহাকবি ব্যাসদেব মহাভারত রচনার সংকল্প ও আয়োজন করলেন, কিন্তু এই মহাকাব্যের লিপিকার হবেন

কে? তাঁর প্রতিটি কথা বুঝে এবং প্রতিটি ছন্দ অনুভব করে শুনে দ্রুত লিখবেন—তেমন লিপিকার কে? ব্যাসদেবের এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মা বললেন: তুমি শ্রীমান্ গণেশের শরণাপন্ন হও। আমরা জানি, স্বয়ং বিষ্ণুদেবও গণেশকে জ্ঞানরাশি স্বরূপ বলে আরাধনা করেছেন।

সকল দেবতার আগে গণেশের পূজা হয়। কারণ গণেশ হচ্ছেন গণদেবতা এবং সিদ্ধিদাতা। কলিযুগে গণশক্তিকে সঙ্ঘশক্তিতে রূপান্তরিত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে বলেই গণেশের পূজা ব্যাপকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। আগেই বলেছি, শনির দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ডটি খসে যায় এবং সেখানে যুক্ত হয় গজানন। আর গণেশের জন্মের পর পৃথিবী প্রীতি উপহার স্বরূপ গণেশকে দিয়েছিলেন মূষিক।

রবীন্দ্রসাহিত্যে এবং রবীন্দ্রধ্যানে গণেশ যদিও ব্যাপক কোন ছায়া ফেলতে পারেনি, তবু তাঁর উপস্থিতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কবি পৌরাণিক গণেশকে স্বমহিমায় গ্রহণ ও বরণ যেমন করেছেন, তেমনি গণেশের মধ্যে তিনি আধুনিক গণেচেতনার বা গণপ্রগতির স্বরূপটাও যেন লক্ষ্য করেছেন। আজকের মানুষ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণার মাধ্যমে এবং নিজেদের প্রবল কর্মতৎপরতার ফলে সভ্যতার উন্নততর লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। এই চলমান জীবনগতিকেই তিনি লক্ষ্য করেছেন গভীর দৃষ্টিতে। 'জাভা যাত্রীর পত্রে' (পত্র-৩) তিনি বলেছেন: গণেশের হাতির মুণ্ডে মানুষের সিদ্ধির মূর্তি। সিদ্ধির দুই দিকে দুই জন্তুর চেহারা, একদিকে রহস্য সন্ধানকারী সূক্ষ্মঘ্রাণ, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, খরদন্ত, চঞ্চল কৌতূহল, সেটা ইঁদুর, সেইটেই বাহন, আর একদিকে বন্ধনে বশীভূত বন্যশক্তি যা দুর্গমের উপর দিয়ে বাধা ডিঙিয়ে চলে, সেই হল যান—সিদ্ধির যানবাহন যোগে মানুষ কেবলই এগিয়ে চলেছে। তার ল্যাবরেটরিতে ছিল ইঁদুর, আর তার য়েরোপ্লেনের মোটরে আছে হাতি।

পুরাণের গণেশ কেমন এক নতুন ভাবে ও ভাবনায় রবীন্দ্রকল্পনাকে পরিপুষ্ট করেছে এবং সেই সঙ্গে এক আধুনিক জীবনসত্য গণেশ-রূপের

মধ্যেই পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। গণেশকে তিনি উপমা স্বরূপ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সেই উপমাই কল্পনা-সৌন্দর্যে ও তাৎপর্যে হয়ে উঠেছে অনুপম।

সঙ্গীতের প্রসঙ্গেও আমরা দেখি কবি গণেশ ও কলাবৌ-এর ধারণাটিকে কত সুন্দর ভাবে প্রয়োগ করেছেন।

একটা সময় ছিল, যখন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ধনীর ঘরেও স্থান পাচ্ছিল না, জনসাধারণের দরবারেও পাচ্ছিল না সমাদর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালীন ঘটনাকে লক্ষ্য করেই 'পথের সঞ্চয়' গ্রন্থের "সংগীত" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন: আমাদের দেশে কলাবধূকে লক্ষ্মীও ত্যাগ করিয়াছেন, গণেশের ঘরেও এখনও তাঁহার স্থান হয় নাই।

কবি কলাবধূ বলতে সঙ্গীতকলাকে বোঝাতে চেয়েছেন, লক্ষ্মী হচ্ছেন ধনীগৃহ আর গণেশ হচ্ছেন জনগণের প্রতিনিধি। এই উপমাটির মধ্যেও পৌরাণিক কাহিনীটি স্পষ্ট দেহ ধারণ করেই বেঁচে আছে। আবার আমরা দেখি কবি সাহিত্যের ক্ষেত্রে জনপ্রিয় হওয়ার সঙ্কট ও সমস্যাটিকে বোঝাতে মূষিকবাহন গণেশকে কত সহজেই কাজে লাগিয়েছেন।

'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারী' গ্রন্থে (১৯২৪, সেপ্টেম্বর ২৪) তিনি অসাধারণ নিপুণতায় এক অভাবনীয় রস সঞ্চার করেছেন এই প্রসঙ্গে, বলেছেন: কাব্য-সরস্বতীর সেবক হয়ে গোলেমালে আজ গণপতির দরবারের তক্‌মা পরে বসেছি, তার ফলে কাব্য-সরস্বতী আমাকে প্রায় জবাব দিয়েছেন আর গণপতির বাহনটি আমার সকল কাজেরই ছিদ্র অন্বেষণ করছেন। কবি এখানে গণেশকে ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ব্যবহার করেছেন। এ ধরনের প্রয়োগ সম্ভবত তাঁর পক্ষেই ছিল সম্ভব।

আগেই বলেছি, সংখ্যাবিচারে বা পরিমাণের হিসেবে রবীন্দ্র-সাহিত্যে গণেশের উপস্থিতি তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও গণপতি-বিচারে গণেশ সেখানে স্বমহিমায় বিরাজিত। কবি গণেশকে প্রথম দিকে পৌরাণিক হিসেবেই দেখেছিলেন, দেখেছিলেন তাঁর অদ্ভুত

মূর্তি-কল্পনার পটভূমিকায় এবং সেই জন্যই তিনি বাইরের রূপটিকে অগ্রাহ্য করে অন্তরের রূপে ডুব দিয়েছিলেন। কবি সনাতন ভারতের মন ও চেতনা দিয়েই ভারতীয় সবকিছুকে প্রত্যক্ষ করেছেন, করেছেন বলেই ভারতীয় সাধনার অন্তর্মুখীনতাকে তিনি সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। দেবতার মূর্তিকল্পনা শুধুমাত্র বাহ্যিক স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত নয়, অন্তর-সম্পদে অভিষিক্ত—এটা পৌরাণিক চেতনা যেমন, তেমনি রবীন্দ্রচেতনা। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা যেন ভারত-চেতনারই ফসলে পরিণত হয়েছে।

তাই আমরা দেখি কবি তাঁর পঞ্চভূত প্রবন্ধের "সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ" প্রবন্ধে বলেছেন: মূষিকবাহন চতুর্ভুজ একদন্ত লম্বোদর গজাননমূর্তি আমাদের নিকট হাস্যজনক নহে; কারণ আমরা সেই মূর্তিকে আমাদের মনের ভাবের মধ্যে দেখি—বাহিরের জগতের সহিত, চারিদিকের সত্যের সহিত তাহার তুলনা করি না। কারণ, বাহিরের জগৎ আমাদের নিকট তেমন প্রবল নহে, ··আমরা যে কোনো একটা উপলক্ষ অবলম্বন করিয়া নিজের মনের ভাবটাকে জাগ্রত করিয়া রাখিতে পারি।

শুধুমাত্র পুরাণবর্ণিত কার্তিকেয়-গণেশ নয়, সামগ্রিক ভাবে পৌরাণিক দেবদেবী এবং কাহিনীই রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ ও অভিভূত করেছে। 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থের "সাকার ও নিরাকার" প্রবন্ধে তিনি বলেছেন: পৌরাণিক ধর্ম ঐতিহাসিক হিন্দুধর্ম। কালক্রমে হিন্দুর অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। বৈদিক আর্যগণ যে সমাজ, যে রীতি, যে বিশ্বাস, যে মানসিক প্রকৃতি লইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, অনার্যদের সংঘর্ষে, মিশ্রণে, বিচিত্র অবস্থান্তরে, স্বভাবের নিয়মে ক্রমশই তাহা রূপান্তরিত হইয়া আসিয়াছে। সেই সকল নব নব অভিব্যক্ত নব নব পুরাণে আপনাকে আকারবদ্ধ করিয়াছে। কবির এই বিশ্লেষণ কি যথার্থই ঐতিহাসিক নয়?

লক্ষ্মী ঃ রবীন্দ্রকল্পনায়

কবির দেবদেবীর প্রতি অনুরাগ ও আকর্ষণ বাস্তব অর্থেই ব্যাপক ও বিস্তৃত। পুরাণে বর্ণিত তেত্রিশ কোটি দেবতার প্রতি না হলেও বিশিষ্ট সকল দেবদেবীর প্রতিই তাঁর অনুরাগ সনাতন হিন্দুর মতই প্রমূর্ত। এই প্রসঙ্গে আমরা ধন ও ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মীর প্রসঙ্গটি উত্থাপন করতে পারি। হিন্দুসমাজে এবং লোকাচারে লক্ষ্মী-সরস্বতী সম্ভবত সব থেকে জনপ্রিয় দেবতা, বলা যায় গণদেবতা। লক্ষ্মী পৌরাণিক দেবী, আর সরস্বতী হচ্ছেন বৈদিক দেবী। প্রায় প্রতি ঘরে এই দুই দেবীর আসন পাতা হয় ঐহিক সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধির কামনায়। আমরা একটু যত্নশীল হলে দেখতে পাব যে, রবীন্দ্রনাথ শিব-দুর্গার মতই লক্ষ্মীর প্রতি অনুরক্ত, অনুরক্ত একটু বিশেষ ভাবে। শুধু সাধারণ ভাবে অনুরক্ত কথাটা বোধহয় প্রযোজ্য নয়, বলা যায়, জগন্মাতা দেবী দুর্গার তুলনায় ঐশ্বর্যবতী লক্ষ্মীদেবীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের টান একটু বেশীই ছিল।

পুরাণে বর্ণিত লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য ও স্বরূপের বিভিন্ন বর্ণনা আমরা পাই ধ্যান ও প্রণাম মন্ত্রে। সেই সকল বর্ণনা থেকেই দেখি লক্ষ্মীর হাতে পাশ ও অঙ্কুশ, তাঁর অঙ্গকান্তি কাঞ্চন-সন্নিভ। চারটি বিরাট হাতি অমৃত বারি দিয়ে তাঁর নিত্য অভিষেক সম্পন্ন করে। লক্ষ্মী সুখপ্রদা—তাঁর অন্য নাম ভূলীলা এবং সেই রূপকল্পনায় দেখি তাঁর হাতে শালি-ধানের মঞ্জরী ও পদ্ম, বক্ষে কৌস্তুভমণি। তিনি বেদবতী—হাতে তাঁর অক্ষমালা। তিনি কমলা, আবার তিনিই শ্রী।

দেবী ভাগবতে লক্ষ্মীর অন্যান্য মহিমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটি কথা: বাণিজ্যরূপা বণিজাং। অর্থাৎ বণিকদের কাছে তিনিই বাণিজ্যরূপা। শুধু তাই নয়, তিনি "সর্বশস্যাত্মিকা" এবং তিনিই "জীবনোপায়রূপিণী"। তিনি হচ্ছেন সকল শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা,

সর্বভূতের জীবিকার উৎস। আবার তিনিই "পাপিনাং কলহাঙ্কুরা"। অর্থ নিয়ে সৃষ্টি হয় পাপ, অর্থ নিয়ে পাপীদের মধ্যে সৃষ্টি হয় কলহ।

লক্ষ্মীকে পুরাণে বলা হয়েছে ভূলীলা। ধান, গম ও শস্য উৎপন্ন হয় ভূমিতেই। তাই লক্ষ্মীর হাতে থাকে ধানের শীর্ষ। তিনি শ্রী ও সম্পদের প্রতীক। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও লক্ষ্মীর সেই মহিমাকেই বরণ করেছেন পরম অনুরাগে। "আলোচনা" গ্রন্থের "সৌন্দর্য ও প্রেম : লক্ষ্মী" রচনায় লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে কবি বলেছেন : লক্ষ্মী, তুমি শ্রী, তুমি সৌন্দর্য, আইস, তুমি আমাদের হৃদয়-কমলাসনে অধিষ্ঠান কর। তুমি যাহার হৃদয়ে বিরাজ কর, তাহার আর দারিদ্র্যভয় নাই। জগতের সর্বত্রই তাহার ঐশ্বর্য। যাহারা লক্ষ্মীছাড়া, তাহারা হৃদয়ের মধ্যে দুর্ভিক্ষ পোষণ করিয়া টাকার থলি ও স্থূল উদর বহন করিয়া বেড়ায়।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্মীর সম্পদকে কুবেরের অটল ও পঞ্জীভূত ঐশ্বর্য হিসেবে দেখেননি, দেখেছেন সমাজ ও সংসারে কল্যাণের প্রতীকরূপে। এ প্রসঙ্গে আমরা 'শিক্ষা' গ্রন্থের "শিক্ষার মিলন" রচনাটির দিকেও চোখে ফেরাতে পারি, যেখানে কবি লক্ষ্মীকে শুধু সম্পদের নয়, শ্রীসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে দেখেছেন। সেখানে সম্পদই শ্রীলাভ করেছে।

পুরাণে বর্ণিত ও উচ্চারিত লক্ষ্মীস্তোত্রে আমরা দেখি, ধনদেবী হচ্ছেন লক্ষ্মী : "শ্রী, কমলা, বিদ্যা, মাতা, বিষ্ণুপ্রিয়া সতী।" আবার তিনি "পদ্মালয়া"। রবীন্দ্রনাথও বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মীকে স্বর্গের বন্ধন ছিন্ন করে মানবলোকে এনে প্রতিষ্ঠা করেছেন, দেখেছেন তাঁকে মানুষের "হৃদয়শতদলবাসিনী" রূপে। কবি একদিকে স্বর্গের দেবীকে মর্ত্যের সুষমায় উজ্জ্বল করে তুলেছেন, অন্যদিকে মর্ত্যের মানবীকে রূপ-গুণ-মহিমায় স্বর্গের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করে দিয়েছেন। এই সংসারে যে নারী স্বীয় প্রসন্নমূর্তি ও ধৈর্যময়ী রূপ দিয়ে দুঃখকষ্টের জ্বালা-যন্ত্রণাকে ম্লান করে দিতে পারেন, বুকভরা স্থৈর্য দিয়ে বহন করতে পারেন অক্লেশে, তিনিই লক্ষ্মী, তিনিই শ্রী। কবি এভাবে দেখেছেন কল্যাণী রূপের মধ্যে লক্ষ্মীর মহিমময় সম্পদকে।

নারীমহিমার বিত্ত ও বৈভবের মধ্যে লক্ষ্মীমহিমাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন বারবার। 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারী' গ্রন্থে ১৯২৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর তিনি বলছেন: লক্ষ্মী সম্বন্ধে আমাদের মনে যে ভাবকল্পনা আছে, তাকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখি নারীর আদর্শে। লক্ষ্মীতে সৌন্দর্য হচ্ছে পরিপূর্ণতার লক্ষণ।...সামঞ্জস্য যখন সম্পূর্ণ হয়, তখনই সুন্দরের আবির্ভাব। কবির এই উক্তির মধ্যে ভারতের জীবন-সত্যই যেন প্রতিফলিত। সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ হলেই সুন্দরের আবির্ভাব ঘটে—এটা আমরা বারবার দেখেছি। বিষ্ণুপ্রিয়া মানবী হয়েও সেই কারণেই দেবী হয়েছেন, সারদামণি মানবীয় সত্তা নিয়েও দেবীতে উত্তীর্ণা। এটা ভারতবর্ষের এক অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতা। সৌন্দর্য এখানে সেবা ও পরিপূর্ণতার লক্ষণ এবং তা না থাকাটাই লক্ষ্মীছাড়া ভাব, সেটাই কুৎসিত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, রমণীর মধ্যে যেখানে আমরা লক্ষ্মীর প্রকাশ দেখিতে পাই, সেখানে আমরা একদিকে দেখি সাজসজ্জা, লীলা-মাধুর্য, আর-এক দিকে দেখি অক্লান্ত কর্মপরতা ও সেবানৈপুণ্য। এই উভয়ের বিচ্ছেদই কুশ্রী ('পথের সঞ্চয়'—খেলা ও সাজ)।

ভারতবর্ষের নারী এই লক্ষ্মী হওয়ার সাধনাই করে চলেছে যুগযুগান্ত ধরে—সেটাই ভারত-ধর্ম। ভোগের মধ্যে নয়, ত্যাগের মধ্যে, বাহ্যিক রূপের মধ্যে নয়, অন্তরের সৌন্দর্যে নারী বিকশিত হয়, সম্পূর্ণ হয়—এই ধারণা কবি বহন করেছেন অক্লেশে। এই প্রসঙ্গে আমরা বলাকা কাব্যগ্রন্থের 'দুই নারী' কবিতাটি অনুসরণ করতে পারি, যেখানে কবি বলছেন:

কোন্ ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্র মন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি।
একজন উর্বশী, সুন্দরী,
বিশ্বের কামনা রাজ্যে রাণী,
স্বর্গের অপ্সরী।

অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী,
বিশ্বের জননী তাঁরে জানি,
স্বর্গের ঈশ্বরী।

এখানে আমরা শুধু লক্ষ্মীরূপের বিশিষ্টতাই লক্ষ্য করি না, সেই সঙ্গে দেখি যে, রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে পুরাণকে অনুসরণ করেছেন সনাতন চেতনায়। পুরাণে বলে, লক্ষ্মী সাগর-কন্যা। অসুর ও দেবতারা যখন সমুদ্রমন্থন করছিলেন, তখন তিনি আবির্ভূ‌তা হয়েছিলেন ক্ষীরোদ-সাগর থেকে। দেবতারা একক শক্তিতে সমুদ্র মন্থন করতে পারেননি, পারেননি বলেই তাঁরা তাঁদের চিরবৈরী অসুরদের সহায়তা নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। দেবতা ও অসুরের সম্মিলিত শক্তিতে ও প্রয়াসে দেবী লক্ষ্মী সমুদ্র গর্ভ থেকে আবির্ভূ‌তা হন। এই বহুশ্রুত রূপকের আড়ালে নিহিত আছে আসল সত্য এবং সেই সত্য হচ্ছে এই যে, দেবাসুরের সম্মিলিত প্রয়াসে সমুদ্রগর্ভ থেকে সেদিন পাওয়া গিয়েছিল প্রচুর রত্নসম্পদ। আর সেই রত্নসম্পদের ভাগাভাগি নিয়েই দেবতা ও অসুরদের মধ্যে দেখা দেয় মনকষাকষি এবং পরিণামে ঘোর যুদ্ধ। প্রমাণিত হল: অর্থই অনর্থের মূল।

পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে লক্ষ্মী ও উর্বশী উঠেছেন সমুদ্রগর্ভ থেকে সমুদ্রমন্থনের ফলে। কবি একই সঙ্গে 'স্বর্গের অপ্সরী' ও 'স্বর্গের ঈশ্বরী'কে উঠে আসতে দেখেছেন, যেমন ভাবে আমরা পুরাণে দেখেছি। এখানে কবি আগাগোড়া পুরাণ-অনুসারী। তিনি নারীর মোহিনী ও কল্যাণী রূপের মিলন ঘটাতে চেয়েছেন লক্ষ্মীর মধ্যে। তাই তিনি বলেছেন: মনে রাখতে হবে উর্বশী কে? সে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী নয়, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী নয়, সে স্বর্গের নর্তকী, দেবলোকের অমৃত—পানসভার সখী।···সে যেন চিরযৌবনের পাত্রে রূপের অমৃত, তার সঙ্গে কল্যাণ মিশ্রিত নেই। সে অবিমিশ্র মাধুর্য। · অন্তত পৌরাণিক কল্পনায় সেই উর্বশী একদিন সত্য ছিল। কিন্তু কোথায় গেল সেদিনকার সেই উর্বশী? আজ তার ভাঙাচোরা পরিচয় ছড়িয়ে আছে অনেক মোহিনীর মধ্যে···উর্বশীকে মনে করে যে সৌন্দর্যের কল্পনা

কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে, লক্ষ্মীকে অবলম্বন করলে সে আদর্শ অন্যরকম হত, হয়তো তাতে শ্রেয়স্তত্ত্বের উঁচু সুর লাগত ('চিত্রা', গ্রন্থপরিচয়)। কবি উর্বশীর মধ্যে কল্যাণীর রূপ দেখেননি, দেখেছেন শ্রেয়োবোধের সম্পূর্ণ অভাব। কবি বৈরাগ্যের সঙ্গে অনুরাগের মিলন ঘটাতে চান—লক্ষ্মীর মধ্যে দেখতে চান দুই বিরুদ্ধ ভাবের সুষ্ঠু সমন্বয়।

আমাদের পৌরাণিক লক্ষ্মীকে বলা হয় চঞ্চলা এবং তাঁর এই চঞ্চল-স্বরূপ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট। ধন বা ঐশ্বর্য প্রতিনিয়তই হস্তান্তরিত হচ্ছে, অসংযত মানুষ অর্থবান্‌ হলেই চঞ্চল ও ভ্রান্তবুদ্ধি হয়, সম্পত্তি নিয়ে হাঙ্গামা ও চাঞ্চল্য ঘটেই থাকে এবং মানুষের ধনভাগ্যও চিরকাল এক রকম থাকে না। এই সব কারণেই লক্ষ্মীকে বলা হয় চঞ্চলা। রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব কল্পনাকে কত সুন্দর ভাবে পুরাণের সাহায্যে চরিত্রায়িত করেছেন—তা আমরা এক্ষেত্রে লক্ষ্য করব। সেই সঙ্গে সঙ্গে আরও লক্ষ্য করব যে, রবীন্দ্রনাথ কোন নতুন ভাবের মিলন ঘটাননি, কোন অবিশ্বাসীর হৃদয়কে উন্মুক্ত করেননি, বরং শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভাব নিয়েই লক্ষ্মীর গুণমুগ্ধ হয়েছেন।

চঞ্চলা লক্ষ্মীকে কবি নানাভাবে দেখেছেন এবং তাঁর চঞ্চলা-রূপকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখা করেছেন। 'সঞ্চয়' গ্রন্থের "রূপ ও অরূপ" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন : জগতে লক্ষ্মী যতক্ষণ চঞ্চল, ততক্ষণ তিনি কল্যাণদায়িনী। লক্ষ্মীকে এক জায়গায় চিরকাল বাঁধিতে গেলেই তিনি অলক্ষ্মী হইয়া উঠেন। কারণ, চঞ্চলতার দ্বারাই লক্ষ্মী বৈষম্যের মধ্যে সাম্যকে আনেন। কবির দৃষ্টিতে লক্ষ্মীমহিমা রীতিমত প্রাণবন্ত। তিনি চঞ্চলা-রূপের মধ্যে সাম্য বিধানকারিণীর এক মহাশক্তিকে প্রত্যক্ষ করেছেন, যা আমাদের পৌরাণিক ধারণারই স্পষ্ট প্রকাশ।

ধন, জ্ঞান ও শীল—এই তিনেরই প্রকাশ ও বিকাশ আমরা লক্ষ্মীর চরিত্রমাহাত্ম্যে দেখতে পাই। সামগ্রিক বিকাশের প্রাণরূপা দেবী বলেই তিনি কমলা। কমলা কেন? কমল বা পদ্মের ন্যায় তিনি সুন্দরী, তাঁর তিনটি চোখই পদ্মের মত আয়ত, তাঁর হাতে পদ্ম এবং তাঁর নিবাস পদ্মবনে। এই যেমন একদিকের পরিচয়, অন্যদিকে তিনি

কমলা, কারণ, কমল বা পদ্ম হচ্ছে বিকাশ বা অভ্যুদয়ের প্রতীক। আর এই বিকাশ বা অভ্যুদয় একান্ত ভাবেই কর্মশক্তি-নির্ভর। সেই জন্যই লক্ষ্মীকে আমরা কর্মশক্তির প্রতীক হিসেবেও বরণ করে থাকি। কবিও লক্ষ্মীর সামাজিক বা দৈবীরূপের সীমায় দৃষ্টিকে সীমিত রাখেন নি, প্রসারিত করে দিয়েছেন মানুষের কর্মশক্তির মধ্যে। "পথের সঞ্চয়" গ্রন্থের "জলস্থল" প্রবন্ধে তিনি বলছেন : বিঘ্নের কাছে যে মাথা হেঁট করিয়াছে, ভয়ের কাছে যে পাশ কাটাইয়া চলিয়াছে, লক্ষ্মীকে সে পাইল না। এই জন্য আমাদের পুরাণকথায় আছে, চঞ্চলা লক্ষ্মী চঞ্চল সমুদ্র হইতে উঠিয়াছেন, তিনি আমাদের স্থির মাটিতে জন্মগ্রহণ করেন নাই। বীরকে তিনি আশ্রয় করিবেন, লক্ষ্মীর এই পণ। কবির এই অনুভবের মধ্যেই যেন ফুটে উঠেছে "বীর-ভোগ্যা বসুন্ধরার" ভাব।

তবে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই যে, কবির দৃষ্টিতে সমুদ্রতনয়া লক্ষ্মী এক বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করেছে। সমুদ্রমন্থনের পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে লক্ষ্মীর সম্পর্ক কবিকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করেছে। তাই তিনি মীরা দেবীকে একটি চিঠিতে লিখছেন : এ বছরের লক্ষ্মী-পূর্ণিমা সমুদ্রের উপরেই দেখা গিয়েছিল। লক্ষ্মী যে সমুদ্রমন্থনে প্রকাশ পেয়েছিলেন (চিঠিপত্র-৪, পত্র-৬৮)। এই প্রসঙ্গে আমরা "মালিনী" নাটকের মালিনী চরিত্রের কল্যাণী রূপের কথাও স্মরণ করতে পারি। সেখানে আমরা দেখি সমুদ্রমন্থনজাত লক্ষ্মীর স্নিগ্ধ-সৌন্দর্যের অপরূপ প্রকাশ। নাটকের তৃতীয় দৃশ্যের রচনাটি এরকম :

> সমুদ্র মন্থনে যবে
> লক্ষ্মী উঠিলেন, তাঁরে ঘেরি কলরবে
> মাতিল উন্মাদনৃত্যে উর্মিগুলি সবে,
> সেই মতো উচ্ছ্বসিত জনপারাবার
> মাঝে তুমি লোকলক্ষ্মী মাতা।

এখানে আমরা মহালক্ষ্মীর বিকল্প একটি নতুন শব্দের সন্ধান পাই, সেটি হচ্ছে 'লোকলক্ষ্মী'। এই শব্দের মধ্যেও যেন লক্ষ্মী মহিমার

মহৎ ও ব্যাপক অর্থ ই বিধৃত। লক্ষ্মী চঞ্চলা আবার তিনিই মানুষের প্রাণশক্তি। মানুষের প্রাণশক্তি তথা কর্মশক্তিকে জাগ্রত করার জন্যই যেমন সম্পদ ও বিত্তের হাতছানি, তেমনি এই সম্পদ ও বিত্ত অচঞ্চল অবস্থায় জগদ্দল পাথরের মতই ভার স্বরূপ হয়ে ওঠে। কবি-দৃষ্টিতে এই দুটি দিকই ধরা পড়েছে। তিনি বলছেন: বোঝা অচল হইয়া থাকিতে চায় বলিয়াই মানুষের প্রাণশক্তি তাহাকে সচল করিয়া তোলে এই জন্যই লক্ষ্মী চঞ্চলা। লক্ষ্মী যদি অচঞ্চল হইতেন তবে মানুষ বাঁচিত না ('কালান্তর' গ্রন্থে লড়াইয়ের মূল)।

মানুষের কর্মশক্তি ও প্রাণশক্তির প্রতীক হচ্ছেন লোকলক্ষ্মী—যিনি সমুদ্র আন্দোলনের মধ্য থেকে উঠে এসেছেন। তিনি উঠে আসেন দুঃখসাগর থেকে, চঞ্চলতা পরম অপরূপের মধ্যে হয়ে ওঠে অনন্ত। পূরবীতে একটি অপূর্ব বর্ণনা আমরা পাই :

আপন প্রাণের চরম কথা
বুঝবে যখন, চঞ্চলতা
তখন হবে চুপ।
তখন দুঃখ সাগর তীরে
লক্ষ্মী উঠে আসবে ধীরে
রূপের কোলে পরম অপরূপ।

আবার আমরা 'শেষের কবিতা' উপন্যাসেও লক্ষ্মীর আবির্ভাবের এক চিত্রময় বর্ণনা পাই। এই উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দুর্ঘটনার পটভূমিতে প্রথম নায়িকার চিত্র-কল্প বর্ণনাটি লক্ষণীয়: সদ্য মৃত্যু-আশঙ্কার কালো পটখান তার পিছনে, তারই উপরে সে যেন ফুটে উঠল একটি বিদ্যুৎরেখায় আঁকা সুস্পষ্ট ছবি—চারি দিকের সমস্ত হতে স্বতন্ত্র। মন্দর-পর্বতের নাড়া-খাওয়া ফেনিয়ে ওঠা সমুদ্র থেকে এইমাত্র উঠে এলেন লক্ষ্মী, সমস্ত আন্দোলনের উপরে—মহাসাগরের বুক তখনো ফুলে কেঁপে উঠছে।

বৈদিক দেবী সরস্বতী বা শিব-পত্নী দুর্গার তুলনায় লক্ষ্মীর মহিমাই যেন কবিকে বেশী আকৃষ্ট করেছে। এ প্রসঙ্গে আমরা 'পঞ্চভূত'

গ্রন্থের "নরনারী" প্রবন্ধটি অনুসরণ করতে পারি। কবি "ক্ষণিকা" কাব্যগ্রন্থের 'কল্যাণী' কবিতায় অকুণ্ঠ চিত্তে সেই কল্যাণময়ী লক্ষ্মীস্বরূপার উদ্দেশে বলেন :

সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ যে গান
আছে তোমার তরে।

সরস্বতী : রবীন্দ্র-অনুধ্যানে

সরস্বতী বৈদিক দেবী। বেদে এই দেবীকে তিনটি বিশেষ অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষণে ভূষিতা করা হয়েছে। কখনও সরস্বতীকে "দেবীতমে" বলে সম্বোধন করা হয়েছে, কখনও "অম্বিতমে" বলে, আবার কখনও "নদীতমে" বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এই তিনটি বিশেষণের ভাব-সমষ্টি এবং সামগ্রিক রূপের মধ্যেই আমরা বৈদিক সরস্বতীকে স্বমহিমায় বিরাজিত দেখি। কল্পনার দেবী ক্রমে ক্রমে ঋষিচেতনায় মূর্তি পরিগ্রহণ করেন। নিরাকারা হলেন সাকারা।

সরস্বতী দেবীতমা—অর্থাৎ দেবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। বেদের বর্ণনায় তিনি জ্ঞানরূপ পীযূষ দান করে অবোধ ও অজ্ঞান মানুষের ভ্রান্তি দূর করেন, মানুষকে তিনিই অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যান, তাই তিনি হচ্ছেন দিব্যব্রহ্ম জ্যোতিঃরূপিণী। যিনি দেবীতমা, তিনিই অম্বিতমা। কারণ অম্বিতমার অর্থ হচ্ছে মাতৃ-শ্রেষ্ঠা। তিনিই অসহায় সন্তানকে পালন করেন, সন্তানের কণ্ঠে ভাষা দান করেন এবং স্নেহপরবশ হয়ে সন্তানকে লালন করেন।

সরস্বতীই নদীতমা। নদী কেবল জলের উৎস নয়, শব্দ বা নাদেরও উৎস। নদ শব্দটি থেকেই নাদ শব্দটির উৎপত্তি। সরস্বতী নদী তাই নাদময়ী। আবার প্রাচীন ভারতবর্ষে সরস্বতী নামের নদীটি ছিল পবিত্রতোয়া। এই নদী পাঞ্জাবের উপর দিয়ে প্রবাহিতা এবং মানুষের প্রাণধারণের প্রয়োজন-পূরণে শস্যসম্পদের মূল কারণ। এই যেমন একদিকের ঘটনা, অন্যদিকে আমরা দেখি, এই নদীর তীরেই

বৈদিক যুগের আর্য ঋষিরা সেই প্রাচীন যুগে আত্ম-উপলব্ধিতে পূর্ণ হয়ে সামগান করতেন, করতেন বেদানুশীলন এবং ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপ বিদ্যাচর্চা। এই নদীর ধারে ধারেই একদিন সেই সুপ্রাচীনকালে, যখন আজকের সভ্য জগৎ অন্ধকারে ছিল, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দর্শন-চিন্তার জন্ম হয়েছিল, এখান থেকেই একদিন সমগ্র বিশ্বকে আহ্বান জানিয়েছিলেন পরিপূর্ণ সাম্যবাদী ঋষিরা : শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। ফলে কালক্রমে বৈদিক চেতনায় দেবী সরস্বতী এবং নদী সরস্বতী একই রূপে বিকশিত। তিনি আমাদের মা দেবীরূপে যেমন, নদীরূপেও তেমনি।

এই প্রসঙ্গে আমরা রমেশ চন্দ্র দত্তের (ঋগ্‌বেদের দেবগণ, পঞ্চম প্রস্তাব) বক্তব্য অনুসরণ করিতে পারি। তিনি বলেছেন : প্রাচীনা দেবদেবীদিগের মধ্যে কেবলমাত্র সরস্বতী দেবী নদীও বটেন, বাগ্‌দেবীও বটেন। সরঃ শব্দ অর্থে জল, সরস্বতী অর্থে জলবতী। ভারতবর্ষে যে সরস্বতী নামক নদী আছে, তাহাই প্রথমে পবিত্র নদী বলিয়া উপাসিত হইত। সুতরাং সরস্বতী নদী অচিরে সেই মন্ত্র ও স্তুতির দেবী, অর্থাৎ বাগ্‌দেবী হইয়া গেলেন।

ঋগ্‌বেদের প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের দশম, একাদশ ও দ্বাদশ মন্ত্র এমন ভাবে রচিত যে, ওই মন্ত্রগুলি একই সঙ্গে নদী ও দেবীর পক্ষে প্রযুক্ত হতে পারে। দ্বাদশ মন্ত্রে আমরা দেখি : সরস্বতী প্রবাহিতা হইয়া প্রভূত জল সৃজন করিয়াছেন এবং জ্ঞান উদ্দীপন করিয়াছেন। এই তিনটি মন্ত্রের ব্যাখ্যা করে সায়ণাচার্য বলেছেন : দ্বিবিধা হি সরস্বতী বিগ্রহবদ্দেবতা নদীরূপাচ। অর্থাৎ, নদী, দেবীর দুই রূপ শেষ পর্যন্ত এক রূপে এসে সার্থকভাবে মিলেছে।

বৈদিক যুগের প্রথম দিকে সরস্বতী সাকারা ছিলেন না, কিন্তু কালক্রমে বাস্তব প্রয়োজনে এবং উপাসনার কারণে সরস্বতী সাকারা হলেন। আমরা দেখি সরস্বতী নদীর কুল ছেড়ে দিয়ে ক্রমে ক্রমে অনেক ঋষি এবং আর্যকে সরস্বতীকুল থেকে দূর দূরান্তে দেশের অন্যান্য প্রান্তে চলে যেতে হয়েছিল বাস্তব কারণেই। তাঁরা যখন অন্যান্য স্থানে বসতি স্থাপন করেন, তখন স্বাভাবিক ভাবেই নদী সরস্বতীর

বিকল্প হিসেবে নিজেদের আরাধ্যা দেবীর ধ্যান করার জন্য তাঁরা মূর্তি কল্পনা করতে থাকেন। সময়ের ব্যবধানে সেই কল্পনাশক্তির বিকাশেই সরস্বতী প্রতিমার আবির্ভাব। সরস্বতী নদীর পবিত্রতা এবং সরস্বতী দেবীর জ্যোতির্ময়তা বোঝাতেই দেবীপ্রতিমা হল শুভ্রবসনা, সর্বশুক্লা। নদীর নাদ এবং নদীকূলের সামগান যেন মূর্ত হয়ে উঠল বীণার মধ্যে। পদ্ম ও হংসও যুক্ত হল পদ্মময় এবং হংস-বিহারে চঞ্চলা নদী সরস্বতীর অস্তিত্বকে স্মরণ করেই। ফলে আর্যঋষির কল্পনায় যে দেবীমূর্তি রচিত হল তার মধ্যেও পবিত্রতোয়া নদীর রূপ রইল স্পষ্ট হয়ে এবং দুই রূপের মিলনে সৃষ্টি হল এক রূপ।

পরবর্তী কালে বৈদিক সরস্বতীই ক্রমবিবর্তনের ধারায় পৌরাণিক সরস্বতীতে পরিণত হন। দেবী ভাগবতে বলা হয়েছে, সরস্বতী আদ্যা প্রকৃতিরই অংশ। অর্থাৎ, তিনিই মহামায়া এবং জগন্মাতার এক বিশেষ রূপ। আবার কোথাও কল্পনা করা হয়েছে যে, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা বৈকুণ্ঠনিবাসী নারায়ণের পত্নী। এ সম্পর্কে পৌরাণিক কাহিনীও আছে। আবার শ্রীশ্রীচণ্ডীর উত্তরলীলায় আমরা দেখি মহাসরস্বতী শুম্ভ ও নিশুম্ভকে সংহার করেছেন। স্কন্দ পুরাণের প্রভাস খণ্ডে দেবী সরস্বতীর নদীরূপে অবতরণের কাহিনী পাই। আবার লোককাহিনীতে আমরা লক্ষ্মী সরস্বতীর সপত্নী-বিরোধের অনেক লৌকিক ঘটনার বর্ণনা দেখেছি।

ত্রেতা যুগে দেখি, ক্রৌঞ্চমিথুনের শোকে বাল্মিকী মুনির অন্তরে যখন গভীর দুঃখবোধ দেখা দিয়েছিল, তখন তমসা নদীর তীরে বাগেশ্বরীর আবির্ভাব ঘটে। দুঃখকাতর ও বেদনাহত মুনির কণ্ঠে ধ্বনিত হল :

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥

শোক থেকে জন্ম বলেই এর নাম শ্লোক। আর এই ছন্দেই রচিত হল রামায়ণ। এখানে অবশ্য সেই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার অবকাশ নেই। সরস্বতী কে এবং কেন সরস্বতীর এই প্রচলিত রূপকল্পনা

—সে সম্পর্কে কিছুটা বোঝার জন্যই আমরা এ বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেছি। কারণ, এ ব্যাপারটা সঠিকভাবে না অনুধাবন করলে সনাতন চেতনার অনুসারী রবীন্দ্রধারণাকেও অনুসরণ করা যাবে না।

আলোচনার প্রারম্ভেই আমরা দেখেছি, সরস্বতী নদী একদা ভারতীয় সভ্যতা তথা বৈদিক সভ্যতার জননীরূপা ছিল। রবীন্দ্রনাথের ধ্যানে ও ধারণায় বৈদিক সভ্যতার জননীরূপা সরস্বতী নদী বারবার স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করেছে। কখনও তিনি বলেছেন: তুমি শুনিয়াছ সরস্বতী কূলে,/আর্য কবি গায় মন প্রাণ খুলে (হিন্দু-মেলায় এটিই তাঁর দ্বিতীয় কবিতা)। আবার তিনি যেন প্রাচীন-ভারতকে প্রত্যক্ষ করেছেন: ঋষিগণ সমস্বরে/এই সামগান করে/···সরস্বতী নদীকূলে (প্রকৃতির খেদ)। কবির চোখে কখনও অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতী তীরেই অস্ত যায় সন্ধ্যাসূর্য। "ভারত পথিক রামমোহন রায়" প্রবন্ধে তিনি সরস্বতীকুলেই উদাত্ত স্বরে সেই অমৃত গান শুনতে পেয়েছিলেন: শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। সরস্বতী নদীর দুই কুলের তপোবন যেন কবি-চিত্তকে অধিকার করে রেখেছিল শৈশব থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত। বার বার তিনি তাঁর ধ্যানদৃষ্টিতে দেখেছেন সরস্বতী নদীর সেই প্রাচীন রূপকে, আর মুগ্ধ হয়েছেন।

শুধুই কি নদী সরস্বতী, দেবী সরস্বতীও কি কবি চিত্তে সমগৌরবের আসন পাতেনি? কবি লক্ষ্মীকে সৌন্দর্য ও কল্যাণের প্রতিমা রূপে যেমন বরণ করেছেন, তেমনি সরস্বতী প্রসঙ্গে বলেছেন. আমাদের শুভ্রবসনা কমলালয়া সরস্বতী একাধারে Truth and Beauty মূর্তিমতী (সাহিত্য ঃ সৌন্দর্যবোধ)। এই উক্তির আলোকে একটি বিষয় অতি সহজেই যে-কোন পাঠকের নজরে পড়বে। কবি এখানে সরস্বতীকে "আমাদের দেবী সরস্বতী" বলে উল্লেখ করেছেন—নিজেকে আলাদা করে ভাবেননি। অথচ তাঁরই সৃষ্টি "বিশ্বনীড়" শান্তিনিকেতনের মধ্যে সরস্বতী পূজা নিষিদ্ধ—কারণ সেখানে কোন প্রতিমা পূজাই চলে না, আর চলবেও না।

লক্ষ্মী-সরস্বতীকে রবীন্দ্রনাথ প্রায় সর্বত্রই একই সঙ্গে পরস্পরের পরিপূরক শক্তি ও প্রেরণা হিসেবে স্মরণ করেছেন এবং পুরাণের অনুসরণে তিনি বিষ্ণু-ভার্যা রূপে লক্ষ্মী-সরস্বতীকে বিষ্ণুর গৃহে অধিষ্ঠিত হতেও দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি এবং সৌন্দর্যের পূজারী। হিন্দু কল্পনায় শ্রী, কল্যাণ, সম্পদ এবং বিদ্যার যেমন কোন বিরোধ নেই, তেমনি রবীন্দ্রনাথও এর মধ্যে কোন বিরোধ লক্ষ্য করেন নি। 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের "কাব্যের তাৎপর্য" প্রবন্ধে তিনি এক অসাধারণ নিপুণতায় সঠিকভাবে পৌরাণিক ধারণাকেই পরিবর্তিত যুগ ও পরিবেশের দিকে লক্ষ্য রেখেই প্রকাশ করেছেন, বলেছেন "সৌন্দর্য-রূপা লক্ষ্মী" এবং "ভাবরূপা সরস্বতী"। আর এই দুজনে মিলেই মানুষের পূর্ণতা। সৌন্দর্য বা ভাব একক ভাবে মানুষকে কি আকৃষ্ট করতে পারে?

এই প্রসঙ্গে আমরা 'পথের সঞ্চয়' গ্রন্থের "সঙ্গীত" প্রবন্ধটিকে স্মরণ করতে পারি। সেখানে রবীন্দ্রনাথ অপরূপ বিশ্লেষণী দক্ষতায় ও বর্ণনায় দেখিয়েছেন, যেমন সাহিত্যে, তেমনি সংগীতে, সর্বত্রই ধনের গুণ, লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীর মিলন হলেই সার্থকতা দেখা দেয়। এই পারস্পরিক মিলনের দিকটা যেমন রবীন্দ্র-ভাবনায় খুবই উজ্জ্বল, তেমনি পুরাণ-কাহিনীতে বর্ণিত লক্ষ্মী-সরস্বতীর মানবিক বিরোধের দিকটাও রবীন্দ্রনাথকে সমভাবেই আকৃষ্ট করেছে। অর্থাৎ, আমাদের দেব-দেবীর অলৌকিক মাহাত্ম্য এবং লৌকিক চরিত্র পাশপাশি বিরাজ করে বলেই দেব দেবী আমাদের পূজ্য এবং আত্মীয়। কোন কোন ব্যাপারে ও প্রসঙ্গে লক্ষ্মীর প্রতি কবির একটু বেশী আকর্ষণ ছিল। তাই লক্ষ্মী সরস্বতীর সপত্নী-বিরোধের প্রসঙ্গে তিনি "চঞ্চলা" লক্ষ্মীর পক্ষই গ্রহণ করেন, বলেন: জনসমাজে লক্ষ্মীরই চাঞ্চল্য-অপবাদ প্রচার হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার সপত্নীর যে নিতান্ত অটল স্বভাব, এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় না (সমাজ: আদিম আর্য নিবাস)।

এই যেমন একদিকে আমরা দেখি যে, কবি লক্ষ্মীর পক্ষে, অন্যদিকে তেমনি আবার দেখি বাণীসাধক কবি সঙ্গত কারণেই বাণীর পূজারী।

তাই 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারী' (১৯১৪, সেপ্টেম্বর) গ্রন্থে তিনি বলছেন : কবি হন বা কলাবিৎ হন....অন্দরে তাঁরা মানেন সরস্বতীকে, সদরে তাঁদের মেনে চলতে হয় লক্ষ্মীকে। সরস্বতী ডাক দেন অমৃতভাণ্ডারে, লক্ষ্মী ডাক দেন অন্নের ভাণ্ডারে। শ্বেতপদ্মের অমরাবতী আর সোনার পদ্মের অলকাপুরী ঠিক পাশাপাশি নেই। 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের "পুরস্কার" কবিতায় কবি ভিন্ন ভঙ্গীতে ঠিক একই ধারণাকে ব্যক্ত করেছেন, বলেছেন : সুরের খাদ্যে জানো মা বাণী/ নরের মেটে না ক্ষুধা। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে লক্ষ্মীকে যেমন অন্নের দেবীরূপে দেখেছেন, তেমনি শুধু গানে যে উদরপূর্তি হয় না—সেটাও বলেছেন।

"অন্ন" আর "অমৃত"—এই দুয়ের পার্থক্য নিরূপণ করেছেন কবি লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর দেবী-মহিমাকে আশ্রয় করেই। রবীন্দ্রনাথ যেন বোঝাতে চেয়েছেন অন্ন জৈবিক প্রয়োজনে অত্যন্ত জরুরী—জীবদেহ ধারণ করতে হলে অন্ন চাইই। কিন্তু সেটাই তো শেষ নয়, মানুষের সামগ্রিক জীবনের চাওয়া এবং পাওয়ার শেষ কথা নয়। তারও উর্ধ্বে কিছু চাওয়ার ও কিছু পাওয়ার আছে বলেই তো মানুষ মানুষ হতে পেরেছে পশুত্বের কারাগার ভেঙে। সেই যে চাওয়া সেটাই তো অমৃত—যা বহন করে আনে শাশ্বত আনন্দের স্বাদ।

পরিণত বয়সে দীর্ঘ জীবনের ভাব ও ভাবনার পরিণামে কবির চিত্তে সরস্বতী এক বিশেষ রূপ ও ধারণার জীবন্ময় প্রতিমূর্তি হয়েই যেন বার বার দেখা দিয়েছেন। সে সময়ে তিনি তাঁর বক্তব্যে ও অনুভবে সরস্বতীর প্রতিই একটু বেশী অনুরাগ দেখিয়েছেন। একটু বেশী ভক্তি। এই প্রসঙ্গে 'শিক্ষক' গ্রন্থে "ছাত্রসম্ভাষণ" রচনাটির দিকে দৃষ্টি ফেরাতে পারি। সেখানে কবি বলছেন : লক্ষ্মী কৃপণ; কারণ লক্ষ্মীর সঞ্চয় সংখ্যাগণিতের সীমায় আবদ্ধ, ব্যয়ের দ্বারা তার ক্ষয় হতে থাকে। সরস্বতী অকৃপণ; কেননা, সংখ্যার পরিমাপে তাঁর ঐশ্বর্যের পরিমাপ নয়, দানের দ্বারা তার বৃদ্ধিই ঘটে। রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যে প্রতিফলিত : বিদ্যা যতই করিবে দান, তত যাবে বেড়ে।

তবে এমন কথা ভাবার কোন অবকাশ নেই যে, কবি রবীন্দ্রনাথ কবি বলেই সরস্বতীর প্রতি কিছুটা বেশী অনুরাগী। কারণ, আমরা অন্যত্র লক্ষ্য করেছি যে, কবি লক্ষ্মীকে "লোকলক্ষ্মী মাতা" (মালিনী নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে) বলে সম্বোধন করেছেন। 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থে (প্রকাশ) "দুঃখ সাগরতীরে" "লক্ষ্মী উঠে আসবে ধীরে"—এমন কথাও তিনি বলেছেন। তিনিই আবার লক্ষ্মীকে "স্বর্গের ঈশ্বরী" বিশেষণে ভূষিত করেছেন।

বৈদিক ধারণায় ও কল্পনায় নদী সরস্বতী ও দেবী সরস্বতী একই সঙ্গে সে-যুগের চেতনায়, মননে ও সাধনায় স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছেন এবং ভাব ও রূপের সমন্বয়ে একের সঙ্গে অপরের অভিন্নতা হয়েছিল প্রতিষ্ঠিত। আমরা একটু যত্নশীল হলেই দেখতে পাব যে, রবীন্দ্রনাথও বৈদিক যুগের সেই কলস্রোতা নদী সরস্বতীর প্রতি যেমন অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন, তেমনি স্বাভাবিকভাবেই নিরাকারবাদী হয়েও ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি দেবী সরস্বতীর। এই প্রসঙ্গে আমরা "বাল্মীকি প্রতিভা" নৃত্যনাট্যের কথা স্মরণ করতে পারি। সরস্বতী তাঁকে কতটা বিমোহিত করেছিল, সেটা আমরা 'ভানুসিংহের পত্রাবলীতে'ও (পত্র ৮) দেখতে পাই। কবি বলছেন: বৃষ্টিতে ধোওয়া রোদ্দুরটি যেন সরস্বতীর বীণার তারগুলো থেকে বেজে-ওঠা গানের মতো সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলেছে।

শুভ্রবসনা এবং বীণাপাণি সরস্বতীর রূপ ও মহিমা এত সুন্দরভাবে অন্য কোন পৌত্তলিকের চোখেও কি কখনও ধরা পড়েছে? রবীন্দ্রনাথ বাইরে সরস্বতীর পূজা করেন নি ঠিকই, সিটি কলেজের রামমোহন হোস্টেলে সরস্বতী পূজা করার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক প্রবন্ধও লিখেছিলেন (এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করব), তবু যখন সেই ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের বাইরের রূপটাকে ভেদ করে কবির ঐশ্বর্যময় অন্তরের দ্বারে তাকাই, তখন সেখানে দেখি, তিনি সযত্নে সাজিয়ে রেখেছেন সরস্বতীর স্বর্ণময় সিংহাসন।

কালী-সাধনা এবং রবীন্দ্রনাথ

শ্রীশ্রীচণ্ডীর মত অনুসারে দেবী জগন্মাতা তিনটি স্বতন্ত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। যিনি জগন্মাতা, তিনিই আবার দেবী মহামায়া। এই মহামায়ার একটি রূপ হচ্ছে মহালক্ষ্মী—অর্থাৎ দেবীর রাজসী রূপ। আরেকটি রূপ হচ্ছে মহাসরস্বতী—এটি দেবীর সাত্ত্বিকী রূপ। আর তৃতীয়টি হচ্ছে মহাকালী—যেটা দেবীর তামসী প্রতিমা। মহাকালী হচ্ছেন আনন্দরূপা। দেবী ভাগবতেও আমরা প্রায় একই বর্ণনা পাই।

এই যেমন একদিকের দেবী-মাহাত্ম্য, অন্যদিকে আমরা দেখি দশমহাবিদ্যার রূপ। কথিত আছে যে, সতীর পিতা দক্ষ শিবহীন যজ্ঞের আয়োজন করেছেন এবং সেই যজ্ঞে স্বীয় কন্যা সতী এবং জামাতা মহাদেবকে আমন্ত্রণ জানান নি। সতী বাপের বাড়ি যেতে চাইলে মহাদেব নিষেধ করেন, বলেন : ওখানে আমাদের নিমন্ত্রণ হয় নি। ওখানে যেতে হবে না। তবু সতী যেতে চান। মহাদেবও নিষেধ করেন। শেষ পর্যন্ত সতী নিজের দশটি রূপ মহাদেবের কাছে তুলে ধরেন, দেখিয়ে দেন যে, তিনিই শক্তি, তিনিই প্রকৃতি। এই দশটি রূপই দশমহাবিদ্যা নামে পরিচিতা। কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা—এই হচ্ছে দশমহাবিদ্যা।

কালী হচ্ছেন দশমহাবিদ্যার মধ্যে প্রথম। পুরাণের কাহিনী থেকে আমরা জানতে পারি যে, অসুরের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে দেবতারা পরাজিত হলে অসহায় রাজ্যচ্যুত দেবতারা প্রাণ বাঁচাতে এবং মান ফিরে পেতে মহাশক্তি মহামায়ার ধ্যান করতে থাকেন। দেবীকে খুশি করার জন্য দেবতারা দেবী আরাধনায় ব্রতী হলেন। শেষ পর্যন্ত দেবী-মহামায়ার শরীর থেকে কৌষিকী নামে আরেক জন

দেবীর আবির্ভাব ঘটে। মহামায়ার দেহের কোষ থেকে জন্ম বলেই ওই দেবীর নাম হয় কৌষিকী। এই দেবী কৌষিকীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই দেবী স্বয়ং কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেন। আর তিনি জগতে কালী বা কালিকা নামে পরিচিতা হন।

কালী হচ্ছেন ভীষণা এবং ঘোরা। পুরাণে এবং তন্ত্রে দেবীর উগ্র ও শিবরূপের, ভীষণা ও শান্তরূপের বর্ণনাও আমরা পাই। তবে কৃষ্ণবর্ণা এই দেবীর পরণে ব্যাঘ্রচর্ম, আর তাঁর অলঙ্কার হচ্ছে নরমুণ্ড। বাংলাদেশ কালী-সাধনার পীঠভূমি। এখানে আমরা কালীর বিভিন্ন রূপও প্রতিমা দেখতে পাই। আগেই আমরা দশ-মহাবিদ্যার বর্ণনা দিয়েছি, কিন্তু সেটাই সব নয়। বিভিন্ন সাধকের ধ্যানে এবং কল্পনায় কল্পনাপ্রবণ এই বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে কালী বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছেন। কোথাও দেখি সিদ্ধকালী, কোথাও দেখি শ্মশানকালী, আবার কোথাও দেখি রক্ষাকালী। এছাড়াও কালীর বিভিন্ন রূপ-বৈচিত্র্য আমরা লক্ষ্য করি। যেমন, ভদ্রকালী গুহ্যকালী, মহাকালী, রটন্তী কালী, চামুণ্ডাকালী, ফলহারিণী কালী, হংসকালী প্রভৃতি।

কালী যেমন ভীষণা—যাকে দেখলেই ভয় হয়, তেমনি কালীই আবার মায়ের হাসিতে সদাই প্রসন্না। তাই আমরা দেখি, একের পর এক সাধক এই কালীর কাছ থেকে কৃপা পেয়েই ধন্য হয়েছেন। মন্ত্রতন্ত্র নয়, পুঁথিগত বিদ্যা দিয়েও নয়, শুধু ভক্তি দিয়েই রামপ্রসাদ মহামায়ার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। আমরা সাধক কমলা-কান্তের কথা জানি, জানি সাধক বামাক্ষ্যাপার ইতিবৃত্তও। তবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবী-আরাধনার মধ্য দিয়ে যেভাবে সাকার ও নিরাকার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে সর্বধর্মসমন্বয়ের মহাবাণী প্রচার করেন—তা এক বিস্ময়কর ইতিহাস। কলকাতার কালীঘাট দক্ষিণেশ্বর ও তারাপীঠ ছাড়াও এই বাংলাদেশে আরও অনেক মাতৃপীঠ আছে—যেখানে বিভিন্ন সাধক মাতৃসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। বাংলাদেশে মাতৃসাধনায় মহিমা প্রতিষ্ঠার একটা আলাদা

ভূমিকা আছে, যা এখানকার সংস্কৃতি ও সমাজ-জীবনের অঙ্গ। এই প্রসঙ্গে আমরা শ্যামাসঙ্গীতের বিশেষ ভূমিকার কথাও স্মরণ করতে পারি।

যদিও আমরা দুর্গা ও কালীকে আলাদা রূপে দেখি, তবু পুরাণের বিবরণে এই দুই দেবীকে কখনও কখনও একই রূপে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দুর্গা হচ্ছেন রাত্রি দেবী, আবার এই রাত্রি দেবীর মধ্যেই কালিকার রূপটি প্রকাশিত। স্কন্দপুরাণের কাহিনীতে বলা হয়েছে, রাত্রি দেবী ব্রহ্মার আদেশে মেনকার মধ্যে প্রবেশ করেন। তারপর মাতা মেনকার মধ্যে যে উমা জন্ম লাভের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, সেই উমার দেহ কৃষ্ণবর্ণে ঢেকে দেন। তাই আমরা কোথাও কোথাও দুর্গার কৃষ্ণবর্ণও দেখি। মহাভারতের দুর্গা কৃষ্ণবর্ণা।

দেবী কালী হচ্ছেন অশুভ-শক্তি-বিনাশিনী, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামী। আমাদের দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামেও আমরা এই কালী-ভাবনার প্রভাব দেখি। চারণকবি মুকুন্দ দাস গান গাইলেন, "জাগো গো, জাগো গো জননি! তুই না জাগিলে শ্যামা আর কেউ জাগিবে না মা, তুই না নাচালে মাগো নাচিবে না ধমনী।" বিদ্রোহী কবি নজরুল যে সকল অপূর্ব শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেন, তা আমরা জানি। ক্ষুদিরাম, বারীন ঘোষ ও শ্রীঅরবিন্দ এই মাতৃ-সাধনারই উত্তরসাধক।

ঘোর অন্ধকার অমাবস্যার রাতে কৃষ্ণবর্ণা কালীর পূজা হয়। রাত্রিদেবী কালী যেন নিজের রূপেই অন্ধকার দূর করেন। দেবী স্বয়ং আলোকময়ী। তাই এই কালীপূজার সময়েই মানুষের মধ্যে আলোর উৎসব করার প্রেরণা আসে। আর সেই প্রেরণা থেকেই জন্ম নিয়েছিল দীপান্বিতা উৎসব। দেবীপূজার দিনে এবং তার আগের দিন রাত্রে আমাদের দেশের মানুষ পরলোকগত পিতৃপুরুষের আত্মার উদ্দেশে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়—নাম যার আকাশপ্রদীপ। এই আকাশ-প্রদীপের আলো দেখেই মৃতজনেরা মাটির পৃথিবীতে নেমে আসেন মহারাত্রির অন্ধকারে। আসলে আমরা এই দিনে স্মরণ করি

আমাদের পিতৃপুরুষকে। মহালয়ার দিনে দেবীপক্ষের সূচনা হয়, পিতৃপক্ষের অবসান হয়। সেদিন আমরা পরলোকগত পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ করি। আর কালীপূজার দিনে, আরেক অমাবস্যায় আমরা আবার আলো তর্পণ করি। জাপানেও এরকম উৎসব আছে —যখন মৃতের আত্মার উদ্দেশে কাগজের নৌকায় বাতি জ্বালিয়ে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

এই যে অন্ধকার থেকে আলোয় প্রবেশের উৎসব, এর সঙ্গে একটি পৌরাণিক কাহিনী জড়িত রয়েছে। একবার বলিরাজ সকল দেবদেবীকে বন্দী করে অন্ধকার কারাগারে আটক করে রেখে-ছিলেন। জ্যোতির্ময় বিষ্ণু সেই বন্দী দেবদেবীদের উদ্ধার করেন—অন্ধকার কারাগার থেকে নিয়ে আসেন আলোর জগতে। এ যেন একটা রূপক বা প্রতীক। মানুষের অন্তরে অন্ধ ভাব থাকে, যখন অজ্ঞানরূপ অন্ধকার মানুষের অন্তরকে ঢেকে রাখে, সেই অন্ধকার অন্তরে জ্ঞানরূপী বিষ্ণুর জ্যোতিতে দেবভাবের উন্মেষ ঘটে। তাই মানুষ যুগ যুগ ধরে রাত্রি দেবী, কালী ও বিষ্ণুর সেই জ্যোতিঃরূপের উপাসনা করে আসছে আলোর উৎসবে।

কালীই সকল দিক আবৃত করে আছেন, তাই দিক হয়েছে বসন তাঁর—আর তিনি হয়েছেন দিগ্-বসনা। বসনহীনা রূপে আমরা তাঁকে দেখি। তিনি মুক্ত-স্বভাবা—কোন বন্ধন নেই তাঁর—তাই তিনি মুক্তকেশী। তাঁর চুল খোলা। কালীর গলায় যে মুণ্ডমালা—তা যেন বর্ণমালার প্রতীক। কামধেনু তন্ত্রে দেবী বলেছেন: মম কণ্ঠে স্থিতং বীজং পঞ্চাশদ্ বর্ণমদ্ভুতম্। রামপ্রসাদও বলেছেন: কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে। কোমরে মানুষের হাতের আঙুল। হাত হচ্ছে কর্মের প্রতীক। আঙুল সেই কর্মের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কালীর তিনটি চোখ। এই তিনটি চোখ দিয়ে তিনি জগতের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান দেখেন। তাঁর চারটি হাত। ডানদিকের ওপরের হাত অভয়, নীচের হাত বরদান করছে, বাঁ দিকের ওপরের হাতে খড়্গ, আর নীচের হাতে নরমুণ্ড। কখনও কখনও

কালী আবার "মহামেঘপ্রভা শ্যাম।"—ঠিক কালো নয়, একটু স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণা। জননীকে একটু মধুর রূপে দেখার জন্যই শ্যামারূপের কল্পনা করা হয়েছে।

শ্যামাকালীর পূজা প্রথম কবে শুরু হয়—সেটা জানতে হলে আমাদের ষোড়শ শতাব্দীর একটি ঘটনার দিকে নজর ফেরাতে হয়। সে সময় বাঙলাদেশে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল ; তাঁর নাম মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। তাঁর লেখা 'তন্ত্রসার' গ্রন্থটি সাধকদের বিরাট অবলম্বন। একবার মহাত্মা আগমবাগীশ স্বপ্নে দেবীর কাছ থেকে আদেশ পেলেন : ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে যাকে প্রথম দেখবে, তার মত মূর্তি তৈরী করে আমার পূজা করবে। আগমবাগীশ পরদিন ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠেই শ্যামবর্ণের এক গোয়ালা-বৌকে প্রথম দেখলেন। গোয়ালা বৌ দেওয়ালে ঘুঁটে দিচ্ছিলেন। তারপর সেই মহিলার মত মূর্তি তৈরী করেই তিনি শ্যামাপূজা প্রবর্তন করেন। ওই ভাগ্যবতী মহিলা মহাত্মাকে দেখে লজ্জায় জিভ কেটেছিলেন ; শ্যামা মূর্তিও তাই জিভ কেটেছেন। পরে এই শ্যামা মূর্তির পূজাই প্রচলিত হয়।

কালী কেন শিবের বুকে দাঁড়িয়ে আছেন ? এই প্রশ্নের উত্তর নানাজন নানা দৃষ্টিকোণ থেকে নানা ভাবে দিয়েছেন। প্রচলিত কাহিনী আছে : কালী প্রলয় রূপ ধরে ঝড়ের গতিতে অসুর বিনাশ করতে চলেছেন। তাঁকে কেউ থামাতে পারে না, কেউ তাঁর সামনেও যেতে সাহস করছেন না। তখন তাঁর স্বামী দেবাদিদেব মহাদেব নিজে পথের মধ্যে শুয়ে রইলেন। কালী সে পথ দিয়ে যাওয়ার সময় কোন কিছু না দেখে মহাদেবের বুকে পা দেন। পা দিয়েই চমকে ওঠেন। কোথায় পা দিলেন দেখতে গিয়ে দেখেন, তিনি তাঁর স্বামীর বুকেই পা দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গেই লজ্জায় তিনি জিভ কাটেন। তাঁর গতিও থেমে যায়।

আবার দার্শনিকরা বলেন অন্য কথা। তাঁরা বলেন, শিব যেন শবের মত শুয়ে আছেন। অর্থাৎ, তিনি নিষ্ক্রিয়। আর সেই নিষ্ক্রিয়া

শক্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছেন সক্রিয়া শক্তি কালী। মা নিজেও কখনও সক্রিয়া, কখনও নিষ্ক্রিয়া; কখনও কালী, কখনও শিব। জল স্থির থাকে তখন সেটা নিষ্ক্রিয়। আবার সেই জলে যখন ঢেউ ওঠে, তখন সেটা সক্রিয়। আসলে দুটোই এক। কালী কাল বা সময়ের অধীন নন, কাল বা সময়কে গ্রাস করেই তিনি কালাতীতা, তিনি কালী। শিব ও কালী একই শক্তির দুটি রূপ।

সেই দার্শনিক তত্ত্বটাই যেন কালীমূর্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। কালী যেমন ধ্বংসের প্রতীক, তেমনি মাতৃভাবেরও প্রতীক। শিব যেমন শান্ত ভাবের প্রতীক, তেমনি কল্যাণেরও প্রতীক। একজন সক্রিয়—তিনি প্রলয় আর সংহার চালিয়ে যাচ্ছেন; আরেক জন, শান্ত। এই দুয়ের মিলনেই শক্তির আসল রূপ। তাই নিষ্ক্রিয়া শক্তির বুকে দাঁড়িয়ে আছেন সক্রিয়া শক্তি।

রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য দেবদেবীর মতই কালীমহিমার প্রতিও বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। 'পথে ও পথের প্রান্তে' গ্রন্থে (অধ্যায় ৩৮) রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : বাদলার দিন মেঘদূতের দিন নয়, এ যে অচলতার দিন। চঞ্চল কালের প্রবল রূপ দেখছি নে বটে, কিন্তু অচঞ্চল দেশের বৃহৎ রূপ দেখা যাচ্ছে—শ্যামাকে দেখলুম না, কিন্তু শিবের দর্শন মিলল। রবীন্দ্রনাথ এখানে চঞ্চল কাল বলতে কালী বা শ্যামাকে বুঝেছেন। 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের "মোহানা" কবিতায় কবি যেন কালীরূপের এক অপূর্ব সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করেন। তিনি এই কবিতাটি লিখেছিলেন কালীপূজার রাত্রে। এই কবিতাটি লেখার সময় কালীপূজার এক বিশেষ তাৎপর্য তাঁর চোখে ধরা পড়ে। তাই তিনি লেখেন :

কালীরে রহে বক্ষে ধরি শুভ্র মহাকাল,
বাঁধে না তারে কালো কলুষ জাল।

শিব ও কালীর রূপ ও মহিমা রবীন্দ্রনাথকে যে কতটা আকর্ষণ করেছিল, সেটা আমরা 'জাভা যাত্রীর পত্র' (পত্র ১৬) গ্রন্থেও দেখতে পাই। তিনি বলেছেন, আমাদের দেশে এক সময়ে শিবকে দুই ভাগ

করে দেখেছিল। একদিকে তিনি অনন্ত, তিনি সম্পূর্ণ, সুতরাং তিনি নিষ্ক্রিয়, তিনি প্রশান্ত ; আর একদিকে তাঁরই মধ্যে কালের ধারা তার পরিবর্তন পরম্পরা নিয়ে চলেছে, কিছুই চিরদিন থাকছে না, এইখানে মহাদেবের তাণ্ডবলীলা কালীর মধ্যে রূপ নিয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমরা কবির "হরহৃদে কালিকা" কবিতাটির কথাও স্মরণ করতে পারি।

শিবের মধ্যে কবি যেমন নিষ্ক্রিয়া শক্তিকে প্রত্যক্ষ করেছেন সনাতন ধারণাকে অণুসরণ করেই, তেমনি অন্নপূর্ণা ও কালীর মধ্যে শক্তিরূপাকে তিনি অনুভব করেছেন। 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে (প্রকৃতি) তিনি বলেছেন : শক্তির ক্ষেত্রে আমরা ঈশ্বরের দুই মূর্তি দেখতে পাই, এক হচ্ছে অন্নপূর্ণা-মূর্তি—এই মূর্তি ঐশ্বর্যের দ্বারা আমাদের শক্তিকে পরিপুষ্ট করে তোলে। আর এক হচ্ছে করালী কালীমূর্তি—এই মূর্তি আমাদের সীমাবদ্ধ শক্তিকে সংহরণ করে নেয়, আমাদের কোনো দিকে শক্তির চরমতায় যেতে দেয় না, না টাকায়, না খ্যাতিতে, না অন্য কোনো বাসনার বিষয়ে।

আবার যখন কবি দেখেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের নামে মানুষের লোভ রক্তপাতের সূচনা করেছে, তখনও কবির মনে এই অন্নপূর্ণা ও কালীরূপের একটি অসাধারণ তাৎপর্য যেন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'জাপান-যাত্রী' (অধ্যায় ৪) গ্রন্থে তিনি বলেছেন : অন্নপূর্ণা আজ হয়েছেন কালী ; তাঁর অন্ন পরিবেষণের হাতা আজ হয়েছে রক্ত পান করার খর্পর। তাঁর স্মিত হাস্য আজ অট্টহাস্যে ভীষণ হল।

এই যে বাণিজ্যের নামে মনুষ্যত্ব বিসর্জন দেওয়ার উদ্যোগ, এই যে ব্যক্তিমানুষের অহংভাব প্রকাশে শক্তির দম্ভ, এটা কবিকে ব্যথিত করেছিল। তিনি বলেছেন : সিদ্ধিলাভের কামনায় এরা অন্যের অর্থ, প্রাণ, অন্যের অধিকারকে বলি দেয়। শক্তিপূজার প্রধান অঙ্গ বলিদান। সেই বলির রক্তে পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে (কালান্তর, বাতায়নিকের পত্র ১)। কবি এখানে শক্তিপূজার যে ভাষ্য দিয়েছেন—তা নিয়ে অবশ্যই বিতর্কের অবকাশ আছে, তবে শক্তির দম্ভে যে

রক্তপাত ঘটছে অবিরত, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি কবিতার কথা সঙ্গত কারণেই মনে হবে, যদিও কবিতাটি অপ্রচলিত এবং প্রায় অজ্ঞাত। কবিতাটির নাম "হরহৃদে কালিকা"। এটি বাংলা ১২৮৭ সনের আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং পরে সেটি রবীন্দ্র-রচনাবলীর অচলিত সংগ্রহে (১, পৃঃ ৪৯৭) স্থান পায়। এই কবিতাটির মধ্য দিয়ে আমরা পৌরাণিক কালীভাবনার এক সার্থক প্রকাশ যেমন দেখতে পাই, তেমনি দেখতে পাই রবীন্দ্রচিত্তে কালীরূপা দেবী-মহিমার পরিব্যাপ্ত অস্তিত্ব। এখানে কবিতাটি থেকে কিছুটা উল্লেখ করছি :

একদা প্রলয়শিঙ্গা বাজিয়া রে উঠিবে!
অমনি নিভিবে রবি, অমনি নিভিবে তারা,
অমনি এ জগতের রাশরজ্জু টুটিবে।
আলোক-সর্বস্বহারা অন্ধ যত গ্রহতারা।
দারুণ উন্মাদ হয়ে মহাশূন্যে ছুটিবে!
ঘুম হতে জাগি উঠি রক্ত আঁখি মেলিয়া
প্রলয় জগৎ লয়ে বেড়াইবে খেলিয়া।
জগতের হাহাকার যবে স্তব্ধ হইবে—
ঘোর স্তব্ধ, মহাস্তব্ধ, মহাশূন্য রহিবে
আঁধারের সিন্ধুরবে অনন্তেরে গ্রাসিয়া—
সে মহান জলধির নাই উর্মি, নাই তীর
সেই স্তব্ধ সিন্ধু ব্যাপী রব আমি ভাসিয়া!
তখনো রবি কি তুই এই বুকে দাঁড়ায়ে,
ভাবনাবাসনাহীন এই বুক মাড়ায়ে?

এই কবিতাটির সূত্রে স্বাভাবিক ভাবেই কবির "সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়" কবিতাটির কথাও মনে পড়ে। মনে পড়ে "মহাস্বপ্ন" কবিতাটির কথাও। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরকে তিনি যেমন পৌরাণিক চিন্তার অনুসারী হয়েই সাধক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন এবং এঁকেছেন,

তেমনি তার এই ব্যাপকতর ভাবনার ক্ষেত্রে স্বমহিমায় স্থান করে নিয়েছেন মহাকাল।

রবীন্দ্রনাথের "মহাকাল" একটি জীবন্ত ধারণা এবং এই ধারণার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেই তিনি কালীমাহাত্ম্যকে বরণ করেছেন। কালী শব্দের ভাবগত দিকটিও কবি নিপুণ দক্ষতায় রূপায়িত করেছেন। তাই তাঁর চোখে কালী-মহিমাটি সঠিকভাবেই ধরা পড়েছে। কালী শুধু উগ্ররূপা নয়, মাতৃরূপাও। শুধু ভীষণা নয়, স্নেহময়ীও। 'গীতবিতানে' পূজা পর্যায়ের (১৬০) গানটি এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। কবি বলেছেন :

সন্ধ্যা হল গো ও মা, সন্ধ্যা হল, বুকে ধরো।

অতল কালো স্নেহের মাঝে ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ করো॥

এই গানের মধ্যে "কালো স্নেহ" কথাটি যেন মাতৃরূপা কালীর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। গানের শেষ পংক্তিটি হচ্ছে : তোমার রাতে মিলাক আমার জীবন-সাঁঝের রশ্মিরেখা। কবি যেন জীবনের শেষপ্রান্তে আত্মসমর্পণ করতে চান মাতৃরূপা কালীর কোলে, যিনি স্বয়ং মৃত্যু-রূপাও। কালীর কাছেই কবি যেন প্রার্থনা করেছেন শেষ আশ্রয়।

ব্রাহ্মণ রবীন্দ্রনাথ

'হে ঐশ্বর্যবান' বলে আমরা রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করি তখনই, যখনই সাহিত্য-সংস্কৃতি-সংগীতের পরিমণ্ডলে দাঁড়িয়ে নিজের ছায়ায় দেখি তাঁর ছায়া। সেটা তাঁর সত্যরূপ—যেখানে কবি রবীন্দ্রনাথ এক বিপুল বৈভব এবং অমিত বিত্ত নিয়ে আমাদের সাহিত্যের আকাশ ছেয়ে দিয়েছেন গৌরবে, সম্পদে। এই রূপের বাইরে আরেকটা রূপ তাঁর স্পষ্ট—সেটা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথ, যিনি মহর্ষির অনুসরণে গ্রহণ ও বরণ করেছেন অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্ম। এই দ্বিতীয় পরিচয়ের আড়ালেই রবীন্দ্রনাথ যেন স্ববিরোধিতার জীবন্ত প্রতীক—যিনি ব্রাহ্ম হয়েও ব্রাহ্মণ, যিনি বচনে ও ভাষণে সংস্কারমুক্তির কথা বললেও, কার্যক্ষেত্রে অবলম্বন করেন সংস্কারের সূত্রকে, অনায়াসেই মেনে নেন সংস্কারের শাসনই। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অঙ্গনে একই সঙ্গে প্রত্যক্ষ করেছেন পিতাকে—যিনি মুখে ব্রাহ্ম, কাজে ব্রাহ্মণ, প্রত্যক্ষ করেছেন স্বীয় জননী সারদাকে, যিনি অপৌত্তলিক স্বামীর মঙ্গলকামনায় গৃহমধ্যে দেবপূজা করেন। নতুন কিছু করার, প্রচলিত রীতি-নীতি ভাঙার কথা বললেও কার্যক্ষেত্রে একমাত্র শালগ্রামশিলাবর্জিত অনুষ্ঠান ছাড়া দেবেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম হয়েও আদিতে এবং অন্তে ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ।

এই যে স্ববিরোধিতা, এই যে ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মণের দ্বৈতরূপ—এটাই রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্র পরিচয়। এই প্রসঙ্গে আমরা ব্রাহ্মণ রবীন্দ্রনাথের সত্যস্বরূপ অনুসরণ করার প্রয়োজনে অতীত-ইতিবৃত্তের কথা স্মরণ করতে পারি—যার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে এক বেদনামিশ্রিত সামাজিক ট্র্যাজেডী। ঠাকুরপরিবার যদিও গোঁড়া ব্রাহ্মণপরিবার—তবু ব্রাহ্মণসমাজে তাঁদের জন্য সম্মানের আসন নির্দিষ্ট ছিল না। কারণ, এই প্রখ্যাত ও প্রভাবশালী পরিবারটি 'পতিত ব্রাহ্মণপরিবার'

হিসেবেই চিহ্নিত ছিল। কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্রাহ্মণপরিবারের সঙ্গে তাঁদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হত না, তবুও তাঁরা ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কোন পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতেও রাজি ছিলেন না। ফলে, তাঁরা স্বগোত্রের 'পিরালী' বা পতিত ব্রাহ্মণপরিবারের সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধ নির্ধারণ করতেন।

ঠাকুরবংশের যিনি আদিপুরুষ, সেই জগন্নাথ কুশারীও 'পিরালী' ব্রাহ্মণের কন্যা বিয়ে করে 'পিরালী ব্রাহ্মণ' হয়েছিলেন। কেন এই পিরালী ব্রাহ্মণ, এবং কেন তাঁরা পতিত, সে সম্পর্কে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রজীবনী'র প্রথম খণ্ডে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য তুলে ধরেছেন। আপাতত আমরা সেই তথ্যগুলিকেই আলোচনার সূত্রে মেনে নিচ্ছি। জনৈক পিরল্যা খাঁর চক্রান্তে এবং চাপে ঠাকুরবংশের পূর্বপুরুষ কামদেব ও জয়দেব জাতিচ্যুত হন এবং এই পিরল্যা খাঁ বা পীর আলির নাম থেকেই এই পতিত ব্রাহ্মণপরিবার পিরালী ব্রাহ্মণ হিসেবে চিহ্নিত হন।

যদিও তাঁরা 'পতিত' হন, তবু তাঁরা ব্রাহ্মণত্বের মোহ ও অহঙ্কার ত্যাগ করতে পারেননি। তাই সে যুগের বিখ্যাত পরিবারের সন্তান দেবেন্দ্রনাথ দক্ষিণ ডিহির এক অখ্যাত পিরালী ব্রাহ্মণপরিবারের কন্যাকেই পত্নী হিসেবে গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে আমরা রবীন্দ্র-নাথের বিবাহ-ঘটিত বিষয়টিও উল্লেখ করতে পারি।

প্রভাতকুমারের রচনা থেকেই জানতে পারি, 'রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সুপুরুষের উপযুক্ত বধূ সংগ্রহের জন্য বহু চেষ্টা হয়; কিন্তু সংকীর্ণ পিরালী ব্রাহ্মণ সমাজে সেরূপ কন্যা সুদুর্লভ। কারণ সেযুগে ছেলেদের বিবাহ হইত বিশ বৎসরের মধ্যে এবং বধূদের বয়স হইত নয় থেকে দশের ভিতরে। রবীন্দ্রনাথের বয়স তেইশ পূর্ণ, সুতরাং তাঁহার জন্য অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্কা বালিকার সন্ধানে সবাই প্রবৃত্ত হইল। একবার এক অ-বাঙালী ধনী পরিবার হইতে বিবাহের প্রস্তাব আসে। ...বিবাহ সেখানে না হইয়া হইল ফুলতলি গ্রামের এগারো বৎসরের এক কৃশ, রুগ্ন, অশিক্ষিত, অত্যন্ত সাধারণ পাড়াগেঁয়ে বালিকার সঙ্গে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া লিখিলেন—বহু সন্ধানেও যখন সর্ববাদিসম্মতিক্রমে কোন বধূ মিলিল না, তখন স্থির হইল ঠাকুর এস্টেটের সামান্য কর্মচারী বেণীমাধব রায়চৌধুরীর একাদশবর্ষীয়া কন্যার সহিত রবির বিবাহ হইবে। এক পিরালীত্ব ছাড়া আর কোন মিল ছিল না এই দুই পরিবারের মধ্যে।'

এই ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম হয়েও ব্রাহ্মণত্বের মোহ বা আবরণ ছিন্ন করতে পারেননি। পারেননি বলেই নিতান্তই অন্ত্যজ এক ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যাকে রবির মত এক সুপুত্রের বধূ নির্বাচন করেছেন, তবু ব্রাহ্মসমাজের কোন অব্রাহ্মণকে মেনে নিতে পারেননি। এ ব্যাপারে তিনি যে কতটা গোঁড়া ছিলেন, তা আরেকটি দৃষ্টান্ত থেকেই প্রমাণিত হবে। কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন তাঁর একান্ত প্রিয়পাত্র এবং ব্রাহ্মসমাজের কুলতিলক। অথচ যেহেতু কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন না, সেইহেতু তাঁকে সমাজের আচার্যপদে দেবেন্দ্রনাথ বরণ করতে রাজি হননি—যার ফলে ব্রাহ্মসমাজে ভাঙন দেখা দেয়। গোঁড়া দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় পুত্র রবীন্দ্রনাথকেই ১৮৮৪ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকপদে নিযুক্ত করেন এবং অন্য কোন অব্রাহ্মণ যাতে এই পদে না আসতে পারেন, সে পথেই প্রাচীর তুলে দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হলে এই ঘটনাগুলিকে অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে। কেন ব্রাহ্মণ রবীন্দ্রনাথ লিখিত বয়ানে ব্রাহ্ম হয়েও সমাজ ও সংসার জীবনে আদৌ ব্রাহ্ম হতে পারেননি, সেটা আজ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকেই বুঝতে হবে।

'ব্রাহ্ম ঠাকুরপরিবার' সেযুগের অন্যান্য কট্টর ব্রাহ্মণপরিবারের তুলনায় যে কিছুমাত্র উদার ছিলেন না, তা আমরা আরও দু'একটি ঘটনার উল্লেখে বুঝতে পারব। 'রবীন্দ্রজীবনী'র প্রথম খণ্ডে (পৃঃ ২০৩) প্রভাতকুমার বলেছেন, 'হিন্দুসমাজবিরোধী কোন অনুষ্ঠান তাঁহাদের সমর্থন বা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিত না। কেশবচন্দ্রের অসবর্ণ বিবাহ-আন্দোলন (১৮৭২) তাঁহাদের সমর্থন পায় নাই,

বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহও তাঁহারা অনুমোদন করিতে পারেন নাই।'

শুধুই কি তাই? প্রভাতকুমার আরও বলেছেন, 'আদি ব্রাহ্ম-সমাজ বিবাহাদি ব্যাপারে বর্ণবিচার করিতেন, উপনয়নাদি বিষয়ে কুলাচার পালন করিতেন।' প্রভাতকুমার আরও বলেছেন (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২২): 'ঠাকুরবাড়ির জামাতাদের প্রায় সকলেই ঘরজামাই। তার বিশেষ কারণ ছিল; পিরালী ব্রাহ্মণপরিবারের ব্রাহ্মণ সন্তানগণ বিবাহ করিয়া পৈতৃক সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেন, তখন জাত হারাইয়া ধনী শ্বশুরের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া তাঁহাদের গত্যন্তর থাকিত না।' অর্থাৎ, ঠাকুরপরিবারের অধিকাংশ জামাই-ই 'ঘরজামাই' হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ স্বীয় কন্যা বেলার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেটা শেষ পর্যন্ত বিষণ্ণ বেদনায় পরিণত হয়।

ব্রাহ্মণ রবীন্দ্রনাথকে সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে এবং সঠিক পটভূমিকায় বুঝতে হলে ব্রাহ্মণের আদর্শ সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ও বর্ণাশ্রম সম্পর্কে তাঁর চেতনা বুঝতে হবে। 'রবীন্দ্রনাথের মনে হইল, বর্ণাশ্রমের আদর্শে সমস্ত জীবনকে ধর্মলাভের উপায়স্বরূপ করিয়া তোলা যায়।.... হিন্দু ভারতের বর্ণাশ্রম আদর্শ কবিকে এমনি মুগ্ধ করিয়াছিল যে, তিনি আজ প্রাচীন ভারতের সমস্তকেই মহান ও রমণীয় করিয়া দেখিতেছেন।' প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় শান্তিনিকেতনে ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাপর্ব প্রসঙ্গে (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৬) আরও বলেছেন: প্রাচীন ভারতের হিন্দু আদর্শ কিভাবে আধুনিক জীবনে সফল হইতে পারে, কিভাবে বর্ণাশ্রম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তদ্‌বিষয়ে কবি চিন্তা করিতেছেন। এই সময়ে লিখিত 'ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধটি এ যুগের মনোভাব-প্রকাশক।

• 'ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধটি কবি লিখেছিলেন কেন এবং কোন্ উদ্দেশ্য-সাধনে, সেটা একটু জেনে নেওয়া ভালো। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে অনুসরণ করেই আমরা জানতে পারি যে,

সমসাময়িককালে বোম্বাই অঞ্চলে একজন সাহেব তার ব্রাহ্মণ কর্মচারীকে পদাঘাত করেছিল। এই ঘটনায় সমগ্র দেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল, দেখা দিয়েছিল জনচিত্তে আলোড়ন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ব্রাহ্মণকে পদাঘাত করার ঘটনাকে নিন্দা করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই ব্রাহ্মণ রবীন্দ্রনাথও এ ব্যাপারে বিচলিত হয়ে পড়েন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার ওভারটুন হলে এক জনসভা হয়-সেখানে রবীন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। লেখক এই প্রবন্ধে ভারতীয় সমাজ-প্রতিষ্ঠানের যে যে আদর্শ তুলে ধরলেন, তাতে অনেকেরই সেদিন মনে হয়েছিল যে, কবি বুঝি হিন্দুর প্রাচীন বর্ণাশ্রমপ্রথা আধুনিক যুগে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করার পক্ষপাতী। অবশ্য অতি সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন কারুর কারুর একথাও মনে হয়েছিল যে, রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণের যে রূপ তুলে ধরেছেন, তা দেশ-কালের বিপরীত। এই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন: 'ব্রাহ্মণকে ভারতবর্ষ নগরকোলাহল ও স্বার্থসংগ্রামের বাহিরে তপোবনে ধ্যানাসনে অধ্যাপকের বেদীতে আহ্বান করিতেছে—ব্রাহ্মণকে তাহার সমস্ত অবমাননা হইতে দূরে আকর্ষণ করিয়া ভারতবর্ষ আপনার অবমাননা দূর করিতে চাহিতেছে।' (রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪, পৃঃ ৩৯৭) এই প্রসঙ্গে আমরা কবির 'হিন্দুত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধটির (রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩, পৃঃ ৫১৮-১৯) কথা স্মরণ করতে পারি, যেখানে তিনি হিন্দুর একনিষ্ঠতা ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের পক্ষেই সওয়াল করেছেন।

'প্রবাসী' পত্রিকার (কার্তিক, ১৩৪৮, পৃঃ ১০-১৩) অনুসরণে আমরা দেখতে পাই যে, ১৩০৯ সনের ৭ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার মহারাজকুমারকে এক পত্র লেখেন। সেই পত্রে তিনি বলেন: 'ভারতবর্ষে যথার্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সমাজের অভাব হইয়াছে—দুর্গতিতে আক্রান্ত হইয়া আমরা সকলে মিলিয়াই শূদ্র হইয়া পড়িয়াছি।...আমি ব্রাহ্মণ আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্প হৃদয়ে লইয়া যথাসাধ্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি ক্ষত্রিয় আদর্শকে নিজের মধ্যে অনুভব করিয়া সেই আদর্শকে ক্ষত্রিয় সমাজে প্রচার করিবার সঙ্কল্প হৃদয়ে

পোষণ করিয়ো। ব্রাহ্মণের শান্ত সমাহিত সাত্ত্বিক ভাবকে তোমরা বরণ করিলে চলিবে না।...ক্ষাত্রতেজ ক্ষাত্রবীর্য না থাকিলে ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা কোথায়?'

একই সঙ্গে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্ম হওয়ায় রবীন্দ্রনাথকে অনেক সময় অনেক বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। সম্ভবত তাঁর চিন্তার জগতেও কখনও কখনও দেখা দিয়াছে নিঃস্বতার জটিলতা।

প্রভাতকুমার বলেছেন (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৬৪): রবীন্দ্রনাথ ১৮৯১ সালে আদমসুমার গ্রহণের সময়ে হিন্দুব্রাহ্ম লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন; এবারও (১৯১১ সালে) তিনি বলিলেন, 'আমি হিন্দুসমাজে জন্মিয়াছি এবং ব্রাহ্মসম্প্রদায়কে গ্রহণ করিয়াছি।... আমরা যে-ধর্মকে গ্রহণ করিয়াছি, তাহা বিশ্বজনীন, তথাপি তাহা হিন্দুরই ধর্ম। এই বিশ্বধর্মকে আমরা হিন্দুর চিত্ত দিয়াই চিন্তা করিয়াছি, হিন্দুর চিত্ত দিয়াই গ্রহণ করিয়াছি।' এই সূত্রে আমরা কবির 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধটির (রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৮, পৃঃ ৪৫২-৭৪) কথা উল্লেখ করতে পারি, যেখানে তিনি বলেছেন যে, ব্রাহ্মধর্ম তার আধ্যাত্মিক প্রেরণা পেয়েছে হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থ থেকে এবং হিন্দু সংস্কৃতির উপরেই ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা।

এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাহ্ম সমাজের অনেকেই কবির উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্বকৌমুদী'তে প্রকাশিত হল 'আদি সমাজ ও উন্নতিশীল ব্রাহ্মসমাজ' (বাংলা ১৩১৯ সন, ১ বৈশাখ) নামে একটি প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধের লক্ষ্য ছিল কবিকে আঘাত করা, কবির বক্তব্যকে সমালোচনা করা। কবি তারই প্রত্যুত্তরে ওই 'হিন্দুব্রাহ্ম' প্রবন্ধ লেখেন 'তত্ত্ব-বোধিনী' পত্রিকায় (১৩১৯, জ্যৈষ্ঠ)। ওই প্রবন্ধের মাধ্যমে কবি সরাসরি 'তত্ত্বকৌমুদী' পত্রিকাকে আক্রমণ করেন, বলেন, 'ব্রাহ্মসমাজ আকস্মিক অদ্ভুত একটা খাপছাড়া কাণ্ড নহে। ইহা স্বতন্ত্র সমাজ নহে, ইহা সম্প্রদায় মাত্র।' অর্থাৎ, তিনি স্পষ্ট করেই ঘোষণা করলেন যে, হিন্দুত্বের আধারেই ব্রাহ্মধর্মের নিবাস।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ যে আশ্রম-বিদ্যালয় গড়ে তোলেন, সেখানেও তিনি সনাতনী। আমরা 'রবীন্দ্রজীবনী'র (দ্বিতীয়, পৃঃ ৫১) অনুসরণে দেখতে পাই: "ব্রহ্মবান্ধবের (উপাধ্যায়) ব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত 'বোর্ডিং বিদ্যালয়' ব্রহ্মচর্যাশ্রমরূপ গ্রহণ করিল। শিষ্যরা গুরুগৃহে যেন বাস করিতেছে, ইহা হইল আদর্শ, রবীন্দ্রনাথ হইলেন গুরুদেব। এই নাম উপাধ্যায় কর্তৃক প্রবর্তিত। উপাধ্যায়ের কঠোর ব্যবস্থায় ছাত্রদের জুতা-ছাতা ব্যবহার নিষিদ্ধ, নিরামিষ ভোজন সার্বজনিক; তবে আহারস্থানে বর্ণভেদ মানাই আবশ্যিক।"

আচারে-বিচারে-আহারে সেই আশ্রমবিদ্যালয়েও বর্ণাশ্রমের রীতিনীতি প্রবর্তিত হল। ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণের জন্য আলাদা ব্যবস্থা। জাতপাতের বিচার থেকে সেই আশ্রমও মুক্তি পায়নি।

রবীন্দ্রনাথের অন্তরে ব্রাহ্মণসত্তা কতটা প্রবল ছিল, সেটা আশ্রম-বিদ্যালয় প্রসঙ্গে, প্রভাতকুমারের কথাতেই জানতে পারি: 'ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শে প্রাতে ও সায়াহ্নে ছাত্রদিগকে গায়ত্রীমন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া ধ্যানের জন্য প্রদত্ত হইত। উপাসনার সময় কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া শুচিস্নাত দেহমনে একান্তে উপবেশন করিতে হইত। উপাসনান্তে পূর্বতন গ্রন্থাগারের মধ্যের ঘরটিতে ছাত্রেরা সমবেত হইয়া বেদমন্ত্র গাহিত;....অতঃপর ছাত্রেরা অধ্যাপকগণের পদধূলি লইয়া প্রণাম করিয়া বন-ছায়াতলে গিয়া পাঠ আরম্ভ করিত। কিন্তু একদিন অ-ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের পদধূলি গ্রহণ করা যায় কিনা তাহা লইয়া সমস্যা দেখা দিয়াছিল।' (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫২)।

শুধুমাত্র কেশবচন্দ্র সেনকে নিয়েই নয়, যখনই কোন অব্রাহ্মণকে নিয়ে সামাজিক বা ধর্মীয় সমস্যা দেখা দিয়েছে, তখনই রবীন্দ্রনাথ স্বীয় পিতার অনুসরণে একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণের মানসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। এক্ষেত্রেও পড়েছিলেন। রবীন্দ্রজীবনীতে দেখি: শান্তি-নিকেতনের পরিচালনার জন্য বিধিব্যবস্থা করা সত্ত্বেও অশান্তি দুই মাসের মধ্যেই দেখা দিল। অশান্তি বাধিল কবির আদর্শীকৃত

বর্ণাশ্রমধর্ম লইয়া। আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় নিয়ম হয় যে, ছাত্রেরা অধ্যাপকদের পদধূলি লইয়া প্রণাম করিবে। সমস্যা বাধিল কুঞ্জলাল ঘোষকে লইয়া, তিনি একে কায়স্থ, তাহার উপর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম। কায়স্থ অধ্যাপককে প্রণাম করা উচিত কিনা, এই লইয়া সমস্যার সৃষ্টি।' (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৭)।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই যে শুধুমাত্র কায়স্থ নয়, কুঞ্জলাল ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের লোক। ব্রাহ্ম হয়েও তিনি কায়স্থ, আবার সাধারণ ব্রাহ্ম হয়েও তিনি আদি ব্রাহ্মের সগোত্র নন। দুদিক থেকে তিনি ছিলেন বিজাতীয়। শেষপর্যন্ত অনেক ভাবনা-চিন্তার পর ব্রাহ্মণের সম্মান রক্ষায় এই সমস্যার সমাধান সাধনে কবি নিজে যে উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন, তা আমরা জানতে পারি আশ্রম বিদ্যালয়ের শিক্ষক মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা একটা চিঠি থেকে (স্মৃতি, পৃঃ ১৪-১৫)। কবি লিখছেন: 'প্রণাম সম্বন্ধে আপনার মনে যে দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা উড়াইয়া দিবার নহে। যাহা হিন্দুসমাজ-বিরোধী তাহাকে এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া চলিবে না; সংহিতায় যেরূপ উপদেশ আছে, ছাত্ররা তদনুসারে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদিগকে পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম ও অন্যান্য অধ্যাপকদিগকে নমস্কার করিবে এই নিয়ম প্রচলিত করাই বিধেয়।'

কবিপত্নীর মৃত্যু হয় বাংলা ১৩০৯ সনের ৭ অগ্রহায়ণ। আর মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে কবি চিঠিটি লেখেন ১৯ অগ্রহায়ণ। কবির এই মানসিকতা এবং আশ্রমের স্বরূপ সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৭) লিখেছেন: 'রবীন্দ্রনাথের আদর্শবাদ বা উপদেশ অধিকাংশ শিক্ষকের জীবনে ও আচরণে কোনদিনই রেখাপাত করিতে পারে নাই। কেহ তাঁহার সাহিত্য, কেহ তাঁহার কলাচর্চা, কেহ তাঁহার সংগীতকে জীবনে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু খুব কম লোকেই তাঁহার ধর্মসাধনা বা তাঁহার প্রগতিশীল সমাজভাবনাকে জীবনে রূপদান করিয়াছেন।'

রবীন্দ্রজীবনীকার রবীন্দ্রনাথের স্ববিরোধী চিন্তাধারার পরিণাম

সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন করেছেন। আসলে সংস্কারমুক্তির কথা বললেও, আশ্রমবিদ্যালয় সম্পর্কে মৌলিক পরিবর্তনের কথা বললেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন চরম সনাতনী। তাই, 'বিদ্যালয় সম্বন্ধে যাহাই বলুন, যাহাই ভাবুন, প্রবন্ধ-রচনায় যতই যুক্তিতর্কের অবতারণা করুন, কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁহাকে প্ল্যানচেটে মিডিয়াম প্রভৃতির আলোচনা করিতে দেখিলে অবাক হইতে হয়। আলমোড়া হইতে প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত একখানি পত্রের মধ্যে তিনি প্ল্যানচেটের কথা বলিতেছেন। তাঁহার শরীর ও মন যখন স্বাভাবিক অবস্থা হইতে নামিয়া পড়িত, তখনই তিনি এইসব তথাকথিত অতিপ্রাকৃত বিষয়ের প্রতি মন দিতেন। কোষ্ঠীর ফলাফল মানিতেন কিনা জানি না, তবে কোষ্ঠী লইয়া নাড়ানাড়ি করিতেন। শিলাইদহ হইতে একবার স্ত্রীকে লিখিয়াছিলেন যে, রথীর কুষ্ঠি পরিক্ষা করতে দিতে হবে।'

প্রভাতকুমারের এইসব উক্তি রবীন্দ্রনাথের সত্যরূপকেই উদ্ঘাটন করে। হিন্দুসমাজের সকল রীতিনীতিকে মেনে নিয়েই তিনি ব্রাহ্ম হতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি আর অন্তরে ব্রাহ্ম হতে পারেননি, যদিও মৌখিকভাবে হওয়ার প্রয়াসী ছিলেন।

আমরা রবীন্দ্রজীবনীতেই দেখেছি যে, বৈদিকমতে রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন সম্পাদিত হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথেরও উপনয়ন সম্পন্ন হয় যথাবিহিত উপচারে। রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন সম্পর্কে প্রভাতকুমার বলেছেন (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৫৮) : "১৮৭৩ মাঘোৎসবের পক্ষকাল পরে রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন হয়, তখন তাঁহার বয়স এগারো বৎসর নয় মাস। এই অনুষ্ঠানে বেদান্তবাগীশ মহাশয় পুরোহিতের ও দেবেন্দ্রনাথ আচার্যের কার্য করেন।....ব্রাহ্মণ মাত্রেই জানেন যে, উপনয়নের পর নতুন ব্রহ্মচারীকে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'নতুন ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে গায়ত্রীমন্ত্রটা জপ করার দিকে খুব-একটা ঝোঁক পড়িল।"

প্রভাতকুমারের জবানীতে আমরা আরও জানতে পারি (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৯) : 'রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একসময় পর্যন্ত উপনয়নাদি হিন্দু-

সংস্কারে বিশ্বাসবান ছিলেন; কারণ আমরা দেখিতে পাই তিনি যথাবিধি জ্যেষ্ঠপুত্রের উপনয়ন সম্পন্ন করেন।...কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ-সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত জামাতাকে উপবীত ধারণের জন্য বৃথাই জিদ করা হইয়াছিল বলিয়া আমরা জানি। রবীন্দ্রনাথ বহুকাল এইসব সামাজিক আচারকে স্বয়ং মানিয়া চলিয়াছিলেন।' শুধু নিয়মরক্ষার মত উপনয়ন নয়, একেবারে গোঁড়া ব্রাহ্মণের মত মুণ্ডিত মস্তকে উপনয়ন। তাই দেখি: 'উপনয়নের পর মুণ্ডিত মস্তকে কেমন করিয়া ফিরিঙ্গি বিদ্যালয়ে যাইবেন, এই ভাবনায় যখন বালক অত্যন্ত ম্রিয়মাণ, এমন দুশ্চিন্তার সময়ে তিনি খবর পাইলেন পিতা এবার তাঁহাকে লইয়া হিমালয়ে যাত্রা করিবেন।'

রথীন্দ্রনাথের উপনয়ন সম্পর্কে আমরা জানতে পারি (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪৬৫): 'ইতিমধ্যে (১৮৯৮) স্থির হইল রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রের উপনয়ন হইবে।...(আদি ব্রাহ্মসমাজে) বর্ণভেদ স্বীকৃত হইত—বিবাহাদি ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কাহারো সহিত নিষ্পন্ন হইতে পারিত না—উপনয়নাদি যথাবিহিত সম্পাদিত হইত; পৌরোহিত্যাদি কর্মে ব্রাহ্মণেতর বর্ণের অধিকার ছিল না।...মহর্ষির ইচ্ছানুসারে রথীন্দ্রের উপনয়ন হইল শান্তিনিকেতন (১০ই বৈশাখ, ১৩০৫)।... রথীন্দ্রনাথের বয়স তখন নয় বৎসর মাত্র...এই অনুষ্ঠানে বহু পণ্ডিতের সমাগম হয়।...যথানিয়ম রথীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্মণ বটুর ন্যায় ভিক্ষাপাত্র লইয়া ঘুরিতে ও তিনদিন শূদ্রাদির মুখদর্শন না করিয়া গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয়।'

বিধবা-বিবাহের ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথ কতটা গোঁড়া ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ কতটা পিতৃপ্রভাবে আচ্ছাদিত ছিলেন, তা আমরা জানতে পারি তরুণ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নীর দ্বিতীয় বার বিবাহ প্রসঙ্গে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য করে বলেন্দ্রনাথের বিধবা পত্নীকে তাঁর পিতৃগৃহ থেকে নিয়ে আসেন, যাতে তাঁর আর দ্বিতীয়বার বিবাহ দেওয়ার আয়োজন না হয়।

ভারতবর্ষের ধর্ম-আন্দোলনে ব্রাহ্মধর্মের ছায়া বা প্রভাব কতটা

পড়েছিল, তা নিয়ে ঐতিহাসিক গবেষণার প্রয়োজন আছে। তবে সেকালের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশের উপর ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব পড়েছিল, সন্দেহ নেই—যে প্রভাব ছিল ক্ষণকালের। কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন ব্রাহ্মধর্মের অসারতাই প্রমাণ করে দিয়েছিল। সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। তবে এ প্রসঙ্গে ব্রাহ্ম-আন্দোলনের একটা মৌলিক দুর্বলতার কথাই স্মরণীয়। সেটা হচ্ছে এই যে, আদি ব্রাহ্মসমাজের দুর্গরূপে চিহ্নিত জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি ব্রাহ্মণত্ব বজায় রেখে ব্রাহ্ম হতে চেয়েছিল। ফলে শেষ পর্যন্ত আদি ব্রাহ্ম-সমাজের অসারতাই হয়েছে প্রমাণিত।

দক্ষযজ্ঞ এবং রবীন্দ্রনাথ

'দক্ষযজ্ঞ' কথাটা আমাদের সাহিত্য ও সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত এবং বিশিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত। পণ্ড বা ধ্বংস অর্থবাচক এই কথাটির সঙ্গে জড়িত রয়েছে বহু প্রচলিত এক পৌরাণিক কাহিনী—যা আমরা প্রায় সকলেই জানি। লৌকিক বিচারে পৌরাণিক দক্ষযজ্ঞ হচ্ছে শ্বশুর ও জামাই-এর চিরন্তন বিরোধের চূড়ান্ত পরিণাম। সাধারণতঃ জামাই ও শ্বশুরের সম্বন্ধ মধুর হয়, এক্ষেত্রে এতটা তিক্ত হল কেন? এ সম্পর্কে আমরা স্কন্দপুরাণ অনুসরণ করতে পারি।

একবার প্রজাপতি দক্ষ নৈমিষারণ্যে যান। সেখানে সমাগত সকল মুনি-ঋষিরাই দক্ষকে দেখে সাদরে অভ্যর্থনা জানান। সেখানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষের জামাই শিবও কিন্তু তিনি স্বীয় শ্বশুরকে দেখে কিছু মাত্র সম্ভ্রম বা সম্মান দেখাননি। এতে অতিমাত্রায় ব্যক্তিত্ব সচেতন ও অহঙ্কারী দক্ষ ভীষণ রেগে যান। অবশ্য দক্ষ স্বমর্যাদার ভ্রান্তিতে শিবকে শুধু স্বীয় কন্যা সতীর বর হিসেবেই দেখেছিলেন। শিব মহিমার ব্যাপারে সচেতন ছিলেন না, সম্ভবত কোন সন্ধানও রাখতেন না। বরং শিবকে তিনি কিছুটা ভিন্ন চোখেই দেখতেন।

কারণ, শিব সতীর বর, তবু তিনি অকুলীন, ভূত-প্রেতের নেতা এবং ভীষণ রকম আত্মাভিমানী। ফলে শিবের নৈমিষারণ্যে ঋষিদের অসৌজন্যমূলক আচরণে দক্ষ এত বেশী রেগে গেলেন যে, তিনি তাকে শায়েস্তা করতে শিবকে "যজ্ঞ বহির্ভূত" বলে ঘোষণা করলেন। দুই বিশিষ্ট শ্বশুর-জামায়ের এই দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত কুলীন ও অকুলীনের দ্বন্দ্বে পরিণত হল, পরিণত হল চিরকালীন, সামাজিক দ্বন্দ্বে। অনেকে এই ঘটনাকে ঐতিহাসিক সমাজ বিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে 'আর্য ও অনার্যের' দ্বন্দ্ব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁদের বক্তব্য : শিব হচ্ছেন অনার্যদের দেবতা এবং আর্যসমাজের যাগযজ্ঞে তাঁর কোনও অধিকার প্রথম দিকে ছিল না ঐতিহাসিক দিক থেকে এটা বাস্তব ঘটনা।।

জামাইকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং অনার্য সমাজকে সংযত করার উদ্দেশ্যে প্রতিহিংসাপরায়ণ দক্ষ কনখল তীর্থে এক বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করলেন। আমন্ত্রণ জানালেন সকল দেবতা ও ঋষিকে। শুধু আমন্ত্রণ জানালেন না স্বীয় কন্যা সতী ও শিবকে। এই সংবাদে সতী স্বাভাবিক করণেই দুঃখ পেলেন, লজ্জা পেলেন। তিনি শিবের কাছে অনুমতি চাইলেন পিতৃগৃহে যাবার জন্য। শিবের তাতে আপত্তি। কারণ আমন্ত্রণ আসেনি। তবু সতী যেতে চান, জানতে যেতে চান, কেন তাঁদের আমন্ত্রণ নেই এই যজ্ঞভূমিতে। শেষ পর্যন্ত শিব অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনুমতি দিলেন। সতী গেলেন দক্ষালয়ে।

কিন্তু পিতৃগৃহে পৌছে সতী নিতান্তই অসহায় বোধ করলেন, তিনি কিছুমাত্র আদর পেলেন না, পরিবর্তে পেলেন অপমানের দুঃসহ বোঝা এবং একান্ত নিরুপায় হয়ে শুনলেন শিবনিন্দা। আর শেষ পর্যন্ত পতি-নিন্দায় ব্যথিত ও জর্জরিত হয়ে আত্মবিসর্জন করলেন। দম্ভ ও অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে শিবকে জব্দ করতে দক্ষ স্বয়ং অনার্যসুলভ আচরণ করলেন। তাই ধৈর্যহারা ও শোককাতর শিব তাঁকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিজের জটাজাল ছিন্ন করে সৃষ্টি করলেন বীরভদ্রকে এবং সেই

বীরভদ্রই দক্ষের দম্ভকে পরাস্ত করে পণ্ড করলেন যজ্ঞ। নিহত হলেন দক্ষ। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে শিবহীন যজ্ঞের সমর্থকরা পেলেন শাস্তি। শিবের রুদ্ররোষ এবং শিব-অনুচরের প্রচণ্ড তাণ্ডবে জগৎ কেঁপে উঠল। শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মার স্তবে শিবের রাগ কমল এবং মস্তকচ্যুত দক্ষ আবার জীবন ফিরে পেলেন। কিন্তু দক্ষের ছিন্ন মুণ্ডুটি আর পাওয়া গেল না বলে সেখানে যুক্ত হল ছাগমুণ্ডু। এভাবেই পুরাণ বর্ণিত দক্ষের দর্প চূর্ণ হয়েছিল এবং শিবমহিমা হয়েছিল প্রতিষ্ঠিত। পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখি, ভোলানাথ শিব সতী-বিরহে চঞ্চল হয়ে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করলেন এবং বিষ্ণুচক্রের আঘাতে সতীদেহের ছিন্ন অংশ থেকেই একের পর এক তীর্থভূমির জন্ম হল। আপাতত সে কাহিনী মুলতুবী থাক—এ প্রসঙ্গে তার পুনরুচ্চারণের কোন প্রয়োজন দেখি না।

পৌরাণিক এই কাহিনী "একেশ্বরবাদী"রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে ও নানাসময়ে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। "ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ" ব্রহ্মের মহিমায় যতটা আকৃষ্ট ও প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, তার চাইতে অনেক বেশী প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন শিবমহিমায়। তিনি নিরাকার-ঈশ্বরে যতটা আত্মলীন ছিলেন, তার চাইতে তিনি পৌরাণিক দেব-দেবীর প্রতি এবং পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি কিছু মাত্র কম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। "দক্ষযজ্ঞের" কাহিনী প্রসঙ্গেও আমরা রবীন্দ্রজীবনে সেই একই সত্যের সন্ধান পাই, একই ঘটনার প্রতিষ্ঠা দেখি। পুরাণ বর্ণিত দক্ষযজ্ঞ রবীন্দ্রদৃষ্টিতে মহিমাময় হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে তাৎপর্যমণ্ডিত।

"সমূহ গ্রন্থের "যজ্ঞভঙ্গ" অংশটি এই প্রসঙ্গে অতিসহজেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। কবি "যজ্ঞভঙ্গে" বলছেন: আমাদের পুরাণে একটি যজ্ঞভঙ্গের ইতিহাস আছে। দক্ষ যখন তাঁহার যজ্ঞে সতী অর্থাৎ সত্যকে অস্বীকার করিয়া মঙ্গলকে অপমানিত করিয়াছিলেন, তখনই প্রচণ্ড উপদ্রব উপস্থিত হইয়া তাঁহার যজ্ঞ বিনষ্ট হইয়াছিল। দক্ষ কেবল নিজের দক্ষতার প্রতি অন্ধ অভিমানবশত: জগতে যে যুগে

এবং যে ক্ষেত্রেই সত্যকে এবং শিবকে স্বীকার করা অনাবশ্যক বলিয়া মনে করিয়াছে, সেই কালে এবং সেইখানেই মহান অনর্থ ঘটিয়াছে।

দক্ষযজ্ঞ কাহিনীর পৌরাণিক আবরণ খসিয়ে এমন শাশ্বত সত্যকে দেখার মত দৃষ্টিশক্তি রবীন্দ্রানাথের ছিল বলেই কবি রবীন্দ্রনাথ দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ হয়েছেন। পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি অশ্রদ্ধা বা অবিশ্বাস নয় বরং পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ও আস্থাকে সম্বল করেই তিনি সেই সকল সনাতন কাহিনীর মর্মোদ্ধার করেছেন। যা সনাতন, তাই শাশ্বত—তাই অন্তরের ধন। দক্ষ সতীকে অস্বীকার করেছিলেন। সত্যকে অস্বীকার করেছিলেন। শিব হচ্ছে মঙ্গলের প্রতীক। শিবকে অপমান করে মঙ্গলকেই অপমানিত করেছিলেন। যেখানে সত্য অস্বীকৃত থাকে, যেখানে মঙ্গল হয় অপমানিত, সেখানে ধ্বংস নেমে আসতে বাধ্য। দক্ষযজ্ঞ তাই পণ্ড হয়েছিল। এমন ব্যাখ্যা শুধু যুক্তি বুদ্ধিকেই উদ্দীপ্ত করে না, সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মননশীলতাকেও অনুপ্রাণিত করে। পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি "অপৌত্তলিক" রবীন্দ্রনাথের এই আকর্ষণ কি তাঁর স্বরূপ ও চেতনাকেই উদ্‌ঘাটিত করে না?

আর্য-অনার্যের সংঘাত এবং বৈদিক দেবসমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য শিবের সংগ্রাম যেন দক্ষযজ্ঞের ঘটনায় প্রতিফলিত। রবীন্দ্রনাথ কবিদৃষ্টি ও ঐতাহাসিক চেতনার মিলন ঘটিয়ে পুরাণের গর্ভে নিহিত সেই সত্যকে অনুভব করেছেন, করেছেন সমাজতত্ত্বের আলোকে বিধৃত। কবির "পারস্যযাত্রী" গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা দেখি পারস্য ভ্রমণের পথে প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ দেখে তার ক্লান্তিহীন-অনুসন্ধিৎসু চোখের সামনে অনার্য আর্য বিরোধের ইতিহাস যেন রক্ত-মাংসের শরীরে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তিনি বলছেন: সেদিনকার দ্বন্দ্বের একটা ইতিহাস আছে পুরাণ কথায়, দক্ষযজ্ঞে। একদা বৈদিক হোমের আগুন নিবিয়েছিল শিবের উপাসক। রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য যে একান্তভাবেই পুরাণ অনুসারী, এবং পুরাণের ঐতিহাসিক মূল্যকে প্রতিষ্ঠা করতেই, সেটা অতি সহজেই বোঝা যায়। দক্ষযজ্ঞ ছিল

বৈদিক হোম এবং সেখানে অনার্য শিব হল অনাহুত। আর শিবেরই সৃষ্টি বীরভদ্র হোমের আগুন নিবিয়ে দিয়েছিল। এখানে ইতিহাস আর পুরাণ অভিন্ন সত্তায় প্রতিষ্ঠিত—যা রবীন্দ্রনাথ আগ্রহে লক্ষ্য করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য' গ্রন্থের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রবন্ধে এই আর্য-অনার্য সংঘাতের মধ্য দিয়ে সমন্বয়ের সূত্রটি লক্ষ্য করেছেন এবং অনার্য শিব এই সমন্বয়ের মাধ্যমেই আর্য দেবতায় যে পরিণত হন, তাও তিনি দেখেছেন। একদা যিনি যজ্ঞ-পণ্ড করে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, পরবর্তীকালে তিনি হয়ে ওঠেন "যজ্ঞেশ্বর"। "দক্ষযজ্ঞের" এই পরিণাম কবি যেন প্রত্যক্ষ করেছেন বাস্তব সত্য হিসেবেই।

দুটি পৌরাণিক কাহিনী

রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র বৈদিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর প্রতিই সনাতন ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে অনুরক্ত হননি, সেই সঙ্গে সঙ্গে তার নিয়তপরিবর্তনশীল মনের সনাতন দর্পণে অনেক পৌরাণিক কাহিনীও সমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের অন্তর্ভেদী চেতনা কখনও কখনও সেই সব পৌরাণিক কাহিনীর অন্তর্লীন সৌন্দর্যকে নিপুণভাবে উদ্ঘাটন করেছে, কখনও কখনও সেই সব ঘটনার আপাত-অলৌকিকত্বকে মেনে নিয়েই নতুন নতুন তাৎপর্যের সন্ধানে ব্রতী হয়েছে। তাই আমরা কোন কোন পৌরাণিক কাহিনীর নতুন ব্যাখ্যা পাই তাঁর লেখনীতে—যা আমাদের মুগ্ধ করে, আমাদের বিস্মিত করে।

আমরা এখানে প্রথমেই গঙ্গার মর্ত্যাবতরণের কাহিনীটিকে আলোচনা করতে চাই। রবীন্দ্রনাথ এই কাহিনী বা ঘটনাকে কী

ভাবে দেখেছিলেন, সেটা বোঝার আগে প্রচলিত ও বহুকথিত কাহিনীটিকে আরেকবার স্মরণ করতে চাই।

বাল্মীকি রামায়ণের আদিকাণ্ডে আমরা গঙ্গার মর্ত্যাবতরণের কাহিনীটি পাই, জানতে পারি, ব্রহ্মকমণ্ডলু থেকে বিষ্ণুপদী গঙ্গার মর্ত্যলোকে আসার ইতিবৃত্ত। অযোধ্যার রাজা ছিলেন সগর। সগরের প্রথমা পত্নী কেশিনীর গর্ভে অসমঞ্জ নামে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু দ্বিতীয়া পত্নী সুমতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করে ষাট হাজার পুত্র। এই অসমঞ্জের এক পুত্র, নাম যার অংশুমান্। একবার রাজা সগর অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন বলে যজ্ঞের অশ্বকে বিশ্বপরিক্রমায় ছেড়ে দিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র নিজের গদী বাঁচাবার জন্য সেই অশ্বকে এনে লুকিয়ে রাখলেন পাতালে কপিল মুনির আশ্রমে। এদিকে যজ্ঞের অশ্ব না পেয়ে সগরের ষাট হাজার পুত্র ছুটল চারদিকে। কিন্তু কোথাও পেল না তাঁরা সেই অশ্ব। তখন মাটি কেটে তারা চলে গেল পাতালে। গিয়ে দেখল ধ্যানমগ্ন কপিল মুনির আশ্রমে সেই যজ্ঞের ঘোড়া। তারা কপিল মুনিকেই অশ্ব-অপহরণকারী মনে করে তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলে মুনির অভিশাপে ষাট হাজার পুত্র এক লহমায় ছাই হয়ে গেল।

এদিকে ষাট হাজার পুত্রের কোন খবর না পেয়ে রাজা সগর নাতি অংশুমানকে পাঠালেন খোঁজ নিতে। অংশুমান শেষ পর্যন্ত পেল তাঁর কাকাদের ছাই-এর সন্ধান, শুনল সেই মর্মান্তিক পরিণতির কাহিনী। এখন উপায়? মহাসমস্যায় পড়লেন সবাই। শেষপর্যন্ত সগর-পত্নী সুমতির ভাই গরুড় বললেন: স্বর্গ থেকে পতিতপাবনী গঙ্গাকে পাতালে নিয়ে সেই জলের ধারা ছাইয়ের ওপর বইয়ে দিতে পারলেই তার ভাগ্নেরা সবাই মুক্তি পাবে।

অংশুমান যজ্ঞের অশ্ব নিয়ে ফিরে এলেন, যজ্ঞও হল—কিন্তু ষাট হাজার মৃত পুত্রের কথা ভেবেই রাজা সগর দেহত্যাগ করলেন। রাজা হলেন অংশুমান। অংশুমানের পর তার পুত্র দিলীপ। দিলীপের পর তার পুত্র ভগীরথ রাজা হলেন। আর

বংশানুক্রমে সকলেরই এক চিন্তা, কী করে ষাট হাজার মানুষের মুক্তি আনা যায়। শেষ পর্যন্ত ভগীরথ জীবনপণ সাধনায় মগ্ন হলেন। তার সাধনায় খুশি হয়ে ব্রহ্মা তাকে বর দিলেন, ঠিক আছে গঙ্গা মর্ত্যাবতরণ করবেন। কিন্তু তিনি বললেন, গঙ্গা যখন স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নামবে, তখন তাঁর প্রবল স্রোত ধারণ করবে কে? একমাত্র জটেশ্বর মহাদেব এই বেগ ধারণ করতে পারেন। তাই তিনি উপদেশ দিলেন : তুমি মহাদেবের তপস্যা কর। তিনি ছাড়া আর কেউই গঙ্গার প্রবল বেগ ধারণ করার ক্ষমতা রাখেন না। শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মার নির্দেশ অনুসারে ভগীরথ মহাদেবের জন্য তপস্যা শুরু করলেন।

মহাদেবের এক নাম আশুতোষ—যিনি অল্পে তুষ্ট হন। হলেনও। তিনি হিমালয়ে উঠে ছড়িয়ে দিলেন নিজের বিশাল জটাজাল, সেই জটাজালে আকাশ গেল ছেয়ে। তারপর তিনি গঙ্গাকে বললেন, এবার নেমে এস। প্রচণ্ড শক্তিতে এবং প্রবল বেগে গঙ্গা নেমে এলেন। আর সেই বিপুল জলধারা এসে বন্দী হল শিবের জটাজালে। আবার ভগীরথ শিবকে প্রসন্ন করলেন স্বীয় সাধনায়। প্রসন্ন শিব জটার বাঁধন থেকে গঙ্গাকে মুক্তি দিলেন, গঙ্গা এসে আশ্রয় নিলেন বিন্দু সরোবরে।

পৌরাণিক ভাষ্য অনুযায়ী গঙ্গার একটা ধারা স্বর্গে প্রবাহিতা—নাম যাঁর মন্দাকিনী। আরেকটি ধারা পাতালে—নাম তাঁর ভোগবতী। আর মর্ত্যে নেমে এল যে ধারা, সে ধারা এনেছিলেন ভগীরথ—তাই নাম হল ভাগীরথী। ভৌগোলিক বিচারে হিমালয়ের গোমুখী শৃঙ্গ থেকে গঙ্গার উৎপত্তি। এরই আট মাইল দূরে গঙ্গোত্রী। গঙ্গা-অলকানন্দার মিলনক্ষেত্রটিই দেবপ্রয়াগ, আর যমুনা ও গুপ্তা সরস্বতীর মিলন ক্ষেত্রটি প্রয়াগ। গঙ্গার মূল ধারাটি পদ্মা নাম নিয়ে আজকের বাংলাদেশের বুক চিরে প্রবাহিতা।

আমরা আবার পৌরাণিক বৃত্তকে অনুসরণ করি। ভগীরথ গঙ্গাকে নিয়ে আসছেন। পথে জহ্নুমুনির আশ্রম প্লাবিত হওয়ায় ক্রুদ্ধ মুনি এক চুমুকে গঙ্গাকে শেষ করে দিলেন। শেষে আবার

ভগীরথের প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে গঙ্গাকে মুক্ত করে দিলেন তিনি আর সেই জন্যই গঙ্গার আরেক নাম জাহ্নবী। অবশেষে গঙ্গার ধারা এল সাগরসঙ্গমে। মুক্ত হল রাজা সগরের ষাট হাজার পুত্র। ভগীরথ মুক্ত করলেন তাঁর পূর্বপুরুষদের।

রবীন্দ্রনাথ গঙ্গার মর্ত্যাবতরণের এই কাহিনীর মধ্যে লক্ষ্য করেছেন প্রেমের প্রবাহ। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রও গঙ্গার পবিত্র ধারাকে "প্রেমপ্রবাহস্বরূপ" বলে "মৃণালিনী" গ্রন্থে (তৃতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।) উল্লেখ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন: গঙ্গা প্রেমপ্রবাহ স্বরূপ, ইহা জগদীশ্বর-পাদপদ্ম-নিঃসৃতা, ইহা জগতে পবিত্র,—যে ইহাতে অবগাহন করে সেই পুণ্যময় হয়। ইনি মৃত্যুঞ্জয়জটা-বিহারিণী, যে মৃত্যুকে জয় করিতে পারে, সেও প্রণয়কে মস্তকে ধারণ করে।...প্রণয় প্রথমে একমাত্র পথ অবলম্বন করিয়া উপযুক্ত সময়ে শতমুখী হয়। প্রণয় স্বভাবসিদ্ধ হইলে শতপাত্রে ন্যস্ত হয়—পরিশেষে সাগর-সঙ্গমে লয়প্রাপ্ত হয়—সংসারস্থ সর্বজীবে বিলীন হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই ভাবধারা রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও স্পষ্ট চেহারা ধারণ করেছে। 'সমুহ গ্রন্থে' "সভাপতির অভিভাষণে" তিনি বলেছেন: তোমরা ভগীরথের ন্যায় তপস্যা করিয়া রুদ্রদেবের জটা হইতে এবার প্রেমের গঙ্গা আনিয়াছ; ইহার প্রবল পুণ্যস্রোতকে ইন্দ্রের ঐরাবতও বাধা দিতে পারিবে না, এবং ইহার স্পর্শমাত্রেই পূর্বপুরুষের ভস্মারাশি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে।

অবশ্য রবীন্দ্ররচনায় বা চেতনায় গঙ্গার মর্ত্যাবতরণের কাহিনী তেমন ভাবে রেখাপাত করেনি, যেমন ভাবে করেছে সমুদ্রমন্থনের কাহিনীটি। সমুদ্রমন্থনের কাহিনী বা কল্পকথা বরীন্দ্রনাথকে যেন বিস্ময় মাধুর্যে বারবার মুগ্ধ করেছে এবং অন্য কোন পৌরাণিক কাহিনী বা উপকথা তাঁকে এতটা প্রভাবান্বিত করতে পারে নি। জীবনের প্রথম পর্ব থেকে অন্তিম পর্ব পর্যন্ত এই কহিনীটি বার বার ঘুরে-ফিরে এসেছে তাঁর লেখায়, তাঁর কথায়, তাঁর ভাবনায়। তিনি এই কাহিনীর সৌন্দর্য, তাৎপর্য ও মাধুর্য লক্ষ্য করেছেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে।

আর এই কাহিনীকে তিনি প্রয়োগ করেছেন বিভিন্ন পটভূমিকায় এবং সেটা করেছেন-নিপুণ শিল্পীর মত সার্থকভাবেই।

রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করার আগে আমরা সমুদ্রমন্থনের কাহিনীটি একটু অনুসরণ করতে পারি—তা'হলে বিষয়টি অনুধাবন করা সহজতর হবে। স্বর্গের দেবতারা মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়ার জন্য এবং অমৃতলাভের অত্যুগ্র কামনায় তাঁদেরই চিরশত্রু প্রতিপক্ষ অসুরদের সঙ্গে একজোট হয়ে সমুদ্রমন্থনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। একটি দণ্ডকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে যেভাবে দুধ থেকে মাখন তোলা হয়, সেভাবেই সমুদ্রকে মন্থন করে অমৃত তোলার কাজে দেবতারা ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এই মন্থনে মন্দর পর্বত হল দণ্ড আর দড়ি হল বাসুকী নাগ। হাজার বছর ধরে এই মন্থন চলতে থাকে, তবু অমৃত ওঠে না। পরিবর্তে দেখা দিল অন্য বিপদ। মন্থনে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে বাসুকী নাগের মুখ থেকে ক্রমাগত বিষ বেরিয়ে আসতে থাকে। সেই ভয়াবহ বিষ ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বময় এবং সেই বিষের জ্বালায় জ্বলতে থাকে পৃথিবী।

এই অবস্থায় দেবতারাও বিপন্ন হয়ে পড়লেন। কিন্তু বাঁচার পথ কোথায়? বাঁচার উপায় কী? সবাই ছুটলেন মহাদেবের কাছে, কাতর প্রার্থনায় বললেন, 'হে আশুতোষ, আপনিই আমাদের অগ্রগণ্য। তাই সমুদ্রমন্থনের ফলে প্রথম যা উঠেছে, তা আপনাকেই গ্রহণ করতে হবে। আত্মভোলা মহাদেব ভীত ও কাতর দেবতাদের এই প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে সেই বিষ নিজেই পান করলেন, বাঁচালেন দেবতাদের, বাঁচালেন পৃথিবীকে। সেই জন্যই মহাদেবের নাম হল নীলকণ্ঠ—যিনি নিজে বিষ পান করে বিশ্বকে নির্বিষ করেছিলেন।

তারপর আবার মন্থনকার্য শুরু হয়ে গেল। অবশ্য মৎস্যপুরাণে বলা হয়েছে যে, সমুদ্রমন্থনের সময় কালকুট বিষ নিজেই বেরিয়ে এসে দেবতাদের বলেছিল, হয় তোমরা আমাকে পান কর, নতুবা আমি তোমাদের গ্রাস করব। অমৃতলোভী দেবতারা কালকুটের এই আহ্বানে ভীত ও বিপন্ন হয়ে পড়েন। তখন মহাদেবই তাঁদের বাঁচান

—নিজে বিষ পান করেন।

সমুদ্রমন্থনের দ্বিতীয় পর্বে একে একে উঠে এলেন সুন্দরী অপ্সরাগণ, বারুণী, উচ্চৈঃশ্রবা এবং কৌস্তুভ মণি। সর্বশেষে উঠে এল সেই পরমকাম্য অমৃত। কিন্তু অমৃত উঠলে কী হবে—সেই অমৃতের ভাগ নিয়ে শুরু হয়ে গেল আবার লড়াই দেবতা ও অসুরদের মধ্যে। কেউ ছাড়বে না। শুরু হয়ে গেল রক্তপাত, যুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত বিষ্ণু দেবতাদের স্বার্থে মোহিনীরূপ ধরে অসুরদের ঠকিয়ে অমৃতপাত্র নিয়ে পালান। অসুরেরা অমৃতহারা হয়ে ছদ্মবেশী বিষ্ণুকে তাড়া করল। বিষ্ণুর সঙ্গে তারা পারল না। সবাই নিহত হল। আসলে, বিষ্ণু চেয়েছিলেন, অমৃতপানের সৌভাগ্য নিয়ে শুধু দেবতারাই অমর হোক, অসুররা যেন সে সুযোগ না পায়।

সংক্ষেপে এই হচ্ছে সমুদ্রমন্থনের কাহিনী। এই কাহিনীটি কবিকে কত ভাবে এবং কত রূপে মুগ্ধ করেছে, তা বলে শেষ করা যায় না।

'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারী' গ্রন্থে (১৮৯০, আগস্ট ২০-২৮) এক বর্ণনায় দেখি, সমুদ্র পীড়ায় আক্রান্ত কবির চিত্তে সমুদ্রমন্থনের কাহিনীটি এসে অনায়াসেই আসন পেতে বসেছে। কেন তাঁর এই সমুদ্রপীড়া—কারণ খুঁজতে গিয়ে কবি বলেছেন: দেবাসুরগণ সমুদ্রমন্থন করে সমুদ্রের মধ্যে যা কিছু ছিল সমস্ত বাহির করেছিলেন। সমুদ্র দেবেরও কিছু করতে পারলেন না, অসুরেরও কিছু করতে পারলেন না, হতভাগ্য দুর্বল মানুষের উপর তার প্রতিশোধ তুলছেন।···সনাতন মন্থনের ঘূর্ণিবেগ যে এখনো সমুদ্রের মধ্যে রয়ে গেছে, তা নরজঠরধারীমাত্রেই অনুভব করেন। যাঁরা করেন না, তাঁরা বোধ করি দেবতা অথবা অসুর বংশীয়।

রবীন্দ্রনাথ এই সমুদ্রমন্থনের মধ্যেই লক্ষ্য করেছেন এক বিরাট কর্মযজ্ঞ। তাই দেখি তাঁর 'পল্লীপ্রকৃতি' গ্রন্থের "কর্মযজ্ঞ" অংশে তিনি বলছেন: দেবদানবকে সমুদ্রমন্থন করতে হয়েছিল, তবে অমৃত জেগেছিল, যে অমৃত সমুদ্রের মধ্যে ছড়ানো ছিল। কর্মের মন্থনদণ্ডের নিয়ত তাড়নায় তবেই আমাদের সকলের মধ্যে যে শক্তি ছড়িয়ে আছে,

তাকে আমরা ব্যক্ত আকারে পাব।

আবার দেখি কবির প্রথম বয়সের রচনায় এই সমুদ্রমন্থন কাহিনীর মধ্যেই ফুটে উঠেছে প্রেমতত্ত্বের স্বরূপ। কবি এখানে সমুদ্রমন্থনের অপরূপ কাহিনীর অন্তরালে নিহিত রূপকটিকে যেন খুঁজে পেয়েছেন পরম বিস্ময়ে। 'বিবিধ প্রসঙ্গ' গ্রন্থের "মনের বাগানবাড়ি" প্রবন্ধে তিনি বলেছেন : প্রেম হৃদয়ের সারভাগ মাত্র। হৃদয় মন্থন করিয়া যে অমৃতটুকু উঠে তাহাই। ইহা দেবতাদিগের ভোগ্য। অসুর আসিয়া খায়, কিন্তু তাহাকে দেবতার ছদ্মবেশে খাইতে হয়। যাহাকে তুমি দেবতা বলিয়া জান, তাহাকেই তুমি অমৃত দাও।……কিন্তু এমন মহাদেব সংসারে আছেন, যিনি দেবতা বটেন, কিন্তু যাহার ভাগ্যে অমৃত জোটে নাই, সংসারের বিষ তাঁহাকে পান করিতে হইয়াছে আবার এমন বহুও আছে, যে অমৃত খাইয়া থাকে।

একদিকে যেমন তিনি এই কহিনীর মধ্যে প্রেমতত্ত্বের মহিমা লক্ষ্য করেন, অন্যদিকে তেমনি এই একই কাহিনীর অন্তরালে তিনি আত্ম-শক্তি উদ্বোধনের বীজমন্ত্রটিকেও চিনে নিতে ভুল করেন না। 'পথের সঞ্চয়' গ্রন্থের "দুই ইচ্ছা" শীর্ষক রচনাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, যেখানে কবি বলেছেন : আমাদের বাসনাকে তাহার সহজ সীমার চেয়ে জোর করিয়া টানিয়া বাড়াইতে গেলেই বিপদ ঘটিবে।……দুঃসাহসে ভর করিয়া……আমাদের আরও ইচ্ছার মন্থনদণ্ডকে ঐদিকেই পাক দিতে গেলে ব্যাধি বিকৃতি ও পাপের বিষ মথিত হইয়া উঠে।

কবি প্রথম জীবনে সমুদ্রমন্থনের মধ্যে দেখেছিলেন প্রেমতত্ত্বের সৌন্দর্য, আর শেষ জীবনে জাগতিক বিচ্ছেদ-বিরোধের বিভিন্ন চেহারা দেখেছেন, যা তিনি প্রকাশ করেছেন ওই রূপকের মাধ্যমেই। 'শিক্ষা' গ্রন্থে "ছাত্র সম্ভাষণ" রচনাটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সংসারের নানা কদর্য মূর্তি দেখে কবি যেন নিরবচ্ছিন্ন দুর্গতির আশঙ্কায় শিহরিত ; তাই তিনি বলছেন : যেন সমস্ত সভ্য জগৎকে এক কল্প থেকে আর এক কল্পের তটে উৎক্ষিপ্ত করবার জন্যে দেববৈত্যে মিলে

মন্থন শুরু করেছেন। এবারকারও মন্থনরজ্জু বিষধর সর্প। বহু ফণাধারী লোভের সর্প। সে বিষ উদ্‌গার করছে। আপনার মধ্যে সমস্ত বিষটাকে জীর্ণ করে নেবেন, এমন মৃত্যুঞ্জয় শিব পাশ্চাত্য সভ্যতার মর্মস্থানে আসীন আছেন কি না, এখনো তার প্রমাণ পাই নি।

এই একটি উপমার মাধ্যমে কবি যেন আধুনিক সভ্যতার সঙ্কটকে নগ্ন মূর্তিতে আবিষ্কার করেছেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে নীলকণ্ঠ শিবের অপরাজেয় জগৎকল্যাণের স্বরূপটিকেও প্রত্যক্ষ করেছেন। মোট কথা পৌরাণিক দেবদেবীর মতই বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী কবিকে ব্যাপক ভাবে ও গভীর ভাবে আবৃত ও আবিষ্ট করে রেখেছে—তার প্রমাণ আমরা বার বার পেয়েছি, বার বার পাই।

সরস্বতী পূজা নিয়ে বিরোধ

১৮৮২ সালের ২ মার্চ ফরওয়ার্ড পত্রিকায় 'সিটি কলেজ স্ক্যাণ্ডাল' শিরোনামায় একটি খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরে দেওয়া হয়েছিল ১ মার্চ কলকাতার এলবার্ট হলে অনুষ্ঠিত এক প্রতিবাদ সভার বিস্তৃত বিবরণ। খবরের মূল বিষয় হল : সিটি কলেজ কর্তৃপক্ষ কিছু সংখ্যক ছাত্রের বিরুদ্ধে যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তারই প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বিকালে প্রধানত ছাত্রদের এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই খবরে সিটি কলেজ কর্তৃপক্ষের মনোভাবকে হাস্যকর ধর্মীয় অন্ধত্ব বলে বর্ণনা করা হয়।

কেন প্রতিবাদ সভা? কেনই বা ধর্মীয় অন্ধত্বের প্রশ্ন? এ সম্পর্কে এই পত্রিকার বিবরণ থেকে জানা যায়। সিটি কলেজের রামমোহন রায় হোস্টেলের ছাত্ররা হোস্টেলে সরস্বতী পূজা করে। এই ছাত্রদের মধ্যে একজন মাত্র ব্রাহ্ম। বাকি সবাই হিন্দু। কলেজ কর্তৃপক্ষ এই সরস্বতী পূজাকেই শৃঙ্খলা ভঙ্গের সামিল বলে মনে করেন এবং

কয়েকজন ছাত্রকে আর্থিক জরিমানা করেন। কারণ কর্তৃপক্ষ মনে করেন রামমোহন রায় হোস্টেলে হিন্দু ছাত্রদের সরস্বতী পূজা করার অধিকার নেই।

সেদিন এই একটি সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে কলকাতার জন-জীবন ভীষণভাবে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল এবং এই একটি পূজাকে কেন্দ্র করে যে প্রচণ্ড বিতর্কের ঝড় দেখা দিয়েছিল তার এক মেরুতে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অন্য মেরুতে ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। ফরওয়ার্ড পত্রিকায় যে প্রতিবাদ সভার খবর দেওয়া হয়েছিল সেই সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন স্বয়ং সুভাষচন্দ্র এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী অভেদানন্দ। এই সভায় গৃহীত একটি প্রস্তাবে বলা হয়, সিটি কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ ভূমিকা বজায় রাখতেও পারেননি। কর্তৃপক্ষ যেভাবে হিন্দু ছাত্রদের জরিমানা করেছেন তার নিন্দা করে অবিলম্বে জরিমানা তুলে নেওয়ার দাবি জানানো হয়।

এই সভায় সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করলেন, সিটি কলেজ কর্তৃপক্ষ হিন্দু ছাত্রদের ধর্মীয় অনুভূতিকে পদদলিত করে যে স্বৈরাচারী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তারই ফলে সিটি কলেজের ছাত্রদের বর্তমান আন্দোলন উদ্ভূত হয়েছে। এই আন্দোলনের প্রতি আমার উষ্ণ ও অকুণ্ঠ সমর্থন আছে। (সুভাষ রচনাবলী, প্রথম পর্ব)।

সিটি কলেজের ছাত্ররা ব্রাহ্ম কর্তৃপক্ষের আপত্তিতে কলেজে সরস্বতী পূজা করতে পারতেন না, পূজার অধিকার ছিল না হোস্টেলেও। সেবার ছাত্ররা জোর করে পূজা করতে চেষ্টা করেন, কর্তৃপক্ষও জোর করে তা বন্ধ করে দেন। তাতেই দেখা দিল সংঘাত এবং সেদিনের উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিবেশে এই আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে উঠল সুভাষচন্দ্রের সক্রিয় সমর্থনে।

এলবার্ট হলের সেদিনের সভায় আরেকজন বক্তা ছিলেন অধ্যাপক জে এন ব্যানার্জি। তিনি খোলাখুলি বললেন কলেজের ওই হোস্টেল ব্রাহ্মদের টাকায় তৈরি হয়নি এবং বিধি-বিধান অনুসারে কর্তৃপক্ষ

হিন্দু ছাত্রদের স্বাধীনভাবে উপাসনার অধিকার হরণ করতেও পারেন না। সরকারী অর্থে ওই হোস্টেল তৈরি হয়েছে এবং এতে ব্রাহ্ম-সমাজের একটি পয়সাও দান নেই।

তারপরই ছাত্ররা ধর্মঘট করেছিল। সিটি কলেজের অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র সঙ্গে সঙ্গে কলেজে গ্রীষ্মের ছুটি ঘোষণা করে ছাত্রদের হোস্টেল ছেড়ে যাবার নির্দেশ দিলেন। তিনি এমন ভয়ও দেখালেন যে, তাঁর নির্দেশ না মানলে ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বসাই বন্ধ করে দেবেন (সুভাষচন্দ্র, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৯৮)।

একটি সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে সেদিন যে সঙ্কট দেখা দিয়েছিল তা থেকে মুক্তির জন্য একটা সম্মানজনক পথের কথাই সুভাষচন্দ্রের মনে ছিল। তাই ১৮ মে ১৯২৮ সালে তিনি এক ভাষণে বললেন, সিটি কলেজের কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রদের মধ্যে একটা সন্তোজনক মীমাংসা স্থাপনের চেষ্টা করা হচ্ছে দেখে আমি সুখী হয়েছি… পৌত্তলিক হিন্দুই হোক আর ব্রাহ্মই হোক কারো স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা ঠিক নয়। আমি বরং জোর দিয়ে বলতে চাই উপাসনার স্বাধীনতা উভয়কেই দেওয়া হোক।…আমি ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দু-সমাজের একটা অংশ বলে বিবেচনা করি।….এখন একটি রীতি দাঁড়িয়ে গেছে যে ব্রাহ্মরা তাঁদের ব্রাহ্ম হিন্দু বলে পরিচয় দেন। বিখ্যাত ব্রাহ্ম ভদ্রলোকরা হিন্দু মহাসভায় একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করছেন (সুভাষ রচনাবলী, প্রথম, ১৭৬)।

এদিকে বাস্তবক্ষেত্রে এ ব্যাপারে কোনরকম মীমাংসার সম্ভাবনাই দেখা দিচ্ছিল না। পরিবর্তে অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশ এই সরস্বতী পূজার প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে আরও উত্তাল হয়ে উঠল। দেখা দিল প্রচণ্ড ছাত্র আন্দোলনের জোয়ার।

এই বিতর্কে একসময় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও জড়িয়ে পড়লেন। হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের মত গোঁড়া ব্রাহ্মদের চাপে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত লেখনী ধারণ করতে এগিয়ে এলেন। ফলে গোটা ব্যাপারটা আরও জটিল এবং ব্যাপক হয়ে পড়ল। রবীন্দ্রনাথ কেন এ ব্যাপারে

এভাবে নিজেকে জড়ালেন? এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের একটি প্রাসঙ্গিক উক্তির মধ্যে: রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম নন, একথা সহস্রবার বলিলেও তাঁহার অন্তরে অন্তরে ব্রাহ্ম ধর্মের সাধনা রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না (তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৩১)।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: এই ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দুসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল। সত্যাগ্রহ অনাহার প্রভৃতি রাজনৈতিক অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া ছাত্ররা শহরে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করিল। ব্রাহ্ম বিদ্বেষী লোকের অভাব নেই, অনেক সম্ভ্রান্ত লোক ছাত্রদের পক্ষ লইয়া বিষয়টাকে জটিল ও কদাকার করিয়া তুলিলেন। কোন কোন রাজ-নৈতিক নেতাও এই আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করেন মাইনরিটির ধর্মাধিকারের বুলি তুলিয়া। ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষও সর্বদা যে সুবিবেচনার পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নহে। হিন্দু সমাজের লোকেরা ব্রাহ্মসমাজের উদারতার অভাবকে নিন্দা করিতে লাগিলেন (তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৩১)।

অবশেষে রবীন্দ্রনাথ এবং দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় (মে ১৯২৮) দুটি প্রবন্ধ লেখেন এবং রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য প্রকাশিত হওয়ার পরই যেন সুভাষচন্দ্র এই আন্দোলনের ব্যাপারে আরও বেশি আপসহীন হয়ে উঠলেন। ব্যাপারটা তখন আর ছাত্র এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না, ছড়িয়ে পড়ল আক্রমণ এবং পাল্টা আক্রমণের ধাক্কায় বৃহত্তর ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি ছিল দীর্ঘ এবং আক্রমণাত্মক। তিনি প্রবন্ধের এক জায়গায় বললেন (তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৩১): ধর্মের স্বাধীনতাই যদি কাম্য হয়, তবে সে স্বাধীনতা শুধু রামমোহন হোস্টেলের হিন্দু ছাত্ররা পাইবে, এমনতো নহে, মুসলমান ছাত্ররাও পাইবে। মুসলমানের পক্ষে গো-কোরবানি ধর্মের অঙ্গ। সুতরাং কর্তৃপক্ষ হোস্টেলে তাহাদের তাহাও করিতে দিতে বাধ্য। সুতরাং এভাবে যুক্তি চলে না, একটা

প্রতিষ্ঠিত সমাজের বিধিবদ্ধ কতকগুলি নিয়ম আছে সেগুলিকে ভাঙ্গিতে চেষ্টা করায় সৌজন্যের অভাব প্রকাশ পায়। সিটি কলেজ ব্রাহ্মদের এবং ব্রাহ্মরা প্রতিমাপূজক নহেন একথা প্রত্যেক ছাত্রই জানেন। কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮৮১) পঞ্চাশ বৎসর পরে হঠাৎ সেখানে প্রতিমা পূজা করিবার জন্য জিদ অশোভন।

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য প্রকাশিত হওয়ার পর ছাত্রদের মধ্যে দেখা গেল বিরূপ প্রতিক্রিয়া। আসলে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কাছে এরকম কোন মতামত আশাই করেননি। এই ঘটনার ঠিক পরেই এলবার্ট হলে (বর্তমান কলেজ স্ট্রীট কফি হাউস) অনুষ্ঠিত এক বিরাট ছাত্র সমাবেশে সুভাষচন্দ্র এক নতুন সংগ্রামের ডাক দিলেন। দিনটি ছিল ১৯২৮ সালের ১৯শে জুন। সুভাষচন্দ্র দৃপ্তভঙ্গিতে বললেন, আপনারা ইতিপূর্বেই শুনেছেন ব্রাহ্ম সমাজের কেউ কেউ বলেছেন এই আন্দোলনের পিছনে রাজনৈতিক আন্দোলনকারীরা আছেন। এরকম যে বলা হবে তা আমি আগেই জানতাম।...... রবিবাবু (কবিগুরু) এবং মিঃ এণ্ড্রুজ (দীনবন্ধু) এ ব্যাপারে এসে লড়েছেন দেখে বড়ই দুঃখিত হয়েছি। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে নিরপেক্ষ থাকাই সঙ্গত ছিল। কিছুদিন পূর্বে যখন আমরা তাঁকে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করতে আহ্বান জানিয়েছিলাম তখন তিনি অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু এখন কেন এই ব্যাপারে তাঁকে ডাকা হল এবং কেনই বা তিনি এলেন বুঝি না। তাঁর প্রবন্ধে তিনি সিটি কলেজের ব্যাপার সম্পর্কে হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন এনেছেন। ধৃষ্টতা হলেও বলব তাঁর এই যুক্তি অসার। সিটি কলেজের ব্যাপার প্রকৃতপক্ষে ঘরোয়া ব্যাপার। ইহা ঠিক শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের ন্যায়। আরেক প্রশ্ন তোলা হয়েছে। যেখানে এতদিন ছাত্ররা এই পূজা করেননি, সেখানে এবার কেন এত জোরের সঙ্গে এই আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে? তবে কি দেড়শত বছর পরাধীন থাকার জন্য আমাদের এখনো স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়েই থাকতে হবে?

সুভাষচন্দ্র এই সভায় মূর্তি পূজার পক্ষে বিভিন্ন যুক্তিতর্ক তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মূর্তির মধ্যে ভগবানের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করি। সসীমের মধ্যে অসীমকে আরোপ করে পূজা করি। কাজেই বিরোধের কিছুই নেই। হিন্দুরা মূর্তিপূজা করলে তাতে ব্রাহ্মদের ধর্মমত কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হয় না।

রবীন্দ্রনাথ যে পরমতসহিষ্ণুতার কথা বলেছিলেন সুভাষচন্দ্র সেই প্রসঙ্গে বললেন, সহিষ্ণুতার অর্থ এই নয় যে, নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করতে হবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ মতানুযায়ী ধর্মপালন করতে পারলে সেটাই প্রকৃত সহিষ্ণুতা। আমার মতে, ছাত্রদের পূজা করতে না দিয়ে ব্রাহ্মরাই বেশী অসহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত কলেজ কর্তৃপক্ষের অনমনীয় মনোভাবের ফলে বিরোধের পরিধি এবং এলাকা হল বিস্তৃত। এদিকে ব্রাহ্ম সমাজ এবং কবিগুরু অন্যদিকে ছাত্র সমাজ এবং সুভাষচন্দ্র—প্রথমদিকে বিরোধের এই ছিল দুই পক্ষ কিন্তু ধীরে ধীরে এক পক্ষ সুভাষচন্দ্রকে দেখিয়ে বিরোধের মধ্যে রাজনীতির গন্ধ খুঁজে পেলেন এবং এ ব্যাপারে অতি সহজেই বিদেশী সরকারকে জড়িয়ে নিলেন। শুধু তাই নয় সুভাষ-চন্দ্রকে নরম করার জন্য কেউ কেউ সোজা গিয়ে দেশবন্ধুজায়া বাসন্তী দেবীর শরণ নিলেন। পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠল।

সুভাষচন্দ্র এই বিরোধের ব্যাপারে স্পষ্ট করে বললেন: কংগ্রেস এ ব্যাপারে কোন সাহায্য করেনি আমি ব্যক্তিগতভাবে ছাত্রদের সাহায্য করেছি।···সরকার ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হয়েও হিন্দু কয়েদীদের (সুভাষচন্দ্রের আন্দোলনের ফলেই) জেলখানায় পূজা করার যে অধিকার দান করেছিল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সিটি কলেজের কর্তৃপক্ষ সে অধিকার দিতে অস্বীকার করেছেন।··· বর্তমান বিরোধের সাথে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের কোন সম্পর্ক নেই। এটা পারিবারিক কলহ।···দুঃখের বিষয় কর্তৃপক্ষ মীমাংসার সোজা পথে যাননি (সুভাষ রচনাবলী, প্রথম, পৃঃ ২২৮-৩০)।

ইতিমধ্যে এই বিরোধের মীমাংসার ব্যাপারে অধ্যাপক অমিয়-কুমার সেনগুপ্ত এসে দেখা করেন সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে এবং প্রাণকৃষ্ণ আচার্য গিয়ে হাজির হন বাসন্তী দেবীর কাছে। এ ব্যাপারে বাসন্তী দেবী আসায় স্বাভাবিকভাবেই সুভাষচন্দ্র মীমাংসার জন্য ব্যস্ত হয়ে অনেকটা বশ্যতা স্বীকার করেন। সাত দফা শর্ত ছেড়ে তখন শুধু একটা শর্তই প্রধান হয় এবং সেটা হচ্ছে : হোস্টেল ছাত্রদের সরস্বতী পূজা করতে দিতে হবে। এই শর্তটিও শেষ পর্যন্ত নানা টাল-বাহানার পর কলেজ কর্তৃপক্ষ মেনে নেননি। বরং কলেজের সামনে যে ছাত্ররা সত্যাগ্রহ করেছিল কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পুলিস সেই ছাত্রদেরই একজনকে গ্রেপ্তার করে। ফলে পরিস্থিতি ও পরিবেশ হয়ে ওঠে অগ্নিগর্ভ। আর তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে ২০ জুলাই এলবার্ট হলের ঐতিহাসিক জনসভায়।

তারপরই কয়েকটি পত্র-পত্রিকা সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে নানা দিক থেকে শাণিত আক্রমণ চালাতে থাকে। এ সম্পর্কে ৮ আগস্ট অনুষ্ঠিত এলবার্ট হলের জনসভায় সুভাষচন্দ্র বললেন : কোনো সংবাদপত্রে অভিযোগ করা হয়েছে যে, ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি আমার বিদ্বেষ আছে। এটা সর্বৈব মিথ্যা। হয়তো আমি বিশ্ব-প্রেমিক হতে পারিনি, তাই বলে কোন সম্প্রদায়ের উপর বিদ্বেষ নেই। আমার দেশের কোন অধিবাসীর প্রতি আমার আক্রোশ নেই। তারপরই সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করলেন : ছাত্রদের দাবি স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালানো ছাড়া আর গত্যন্তর নেই (সুভাষ রচনাবলী, প্রথম, পৃঃ ২৪৪)।

এই বিরোধের জের দীর্ঘকাল ধরে চলে। দেশের মানুষ সুভাষচন্দ্রকে মাথার মণি করে নিলেও সিটি কলেজে তাঁর আমন্ত্রণ ছিল না কখনো, ছিল না প্রবেশাধিকার। কিন্তু ওই ঘটনার দশ বছর পরে ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র যখন "দেশের রাষ্ট্রপতি" নির্বাচিত হলেন এক ঐতিহাসিক সংগ্রামে জয়ী হয়ে তখন সমগ্র দেশের প্রবল জন-তরঙ্গের সমর্থনের সামনে দাঁড়িয়ে সিটি কলেজ কর্তৃপক্ষও মত ও পথ

বদল কয় ছাত্রদের দাবিতেই সুভাষচন্দ্রকে সে কলেজে সম্বর্ধনা জানাতে আমন্ত্রণ জানান।

এই প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবে রবীন্দ্রজীবনের এক অনিবার্য স্ববিরোধিতার বিষয়টি স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। প্রথমেই দেখেছি, কবি সরস্বতী বন্দনার রচনায় ও আচরণে কতটা আন্তরিক এবং একাগ্র। অথচ শেষে এসে দেখছি, তিনিই প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে সরস্বতী পূজার বিরুদ্ধাচরণ করছেন। সনাতন ভারতবর্ষের মূর্ত প্রতীক রবীন্দ্রনাথ কল্পনার মাধুর্যে সরস্বতী মহিমায় মুগ্ধ ও আবিষ্ট হলেও ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ পারিপার্শ্বিক প্রভাবে সরস্বতী পূজার বিরুদ্ধাচরণ করতে দ্বিধা করেন না। রবীন্দ্রজীবনের আগাগোড়া এরকম আত্ম-বিরোধ বারবার প্রকট। তবু গঙ্গা যমুনা ব্রহ্মপুত্রের মতই, রবীন্দ্র-চেতনা মূলত দেবতাপ্রেমে সঞ্জীবিত এবং তাই মহিমান্বিত।

এই বইয়ের উৎস

রবীন্দ্রজীবনী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

রবীন্দ্র সংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস—পম্পা মজুমদার।

দেব-দেবী ও তাঁদের বাহন—স্বামী নির্মলানন্দ।

হিন্দুদের দেব-দেবী—উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ—ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য।

ব্রাহ্মধর্ম—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সংকলিত এবং সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত।

আত্মজীবনী—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস—শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

গীতা পাঠ—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পৌরাণিক অভিধান—সুধীরচন্দ্র সরকার।

ভারত পথিক রবীন্দ্রনাথ—প্রবোচন্দ্র সেন।

রবীন্দ্র গ্রন্থ পরিচয়—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমার জীবন—নবীনচন্দ্র সেন।

শ্রীমদ্-ভগবদগীতা—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদিত।

সাহিত্য সাধক চরিত মালা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবীন্দ্রভাবনায় নারায়ণ—প্রবোধচন্দ্র সেন।

রবীন্দ্রভাবনায় বিশ্বশক্তির মাতৃরূপ—প্রবোধচন্দ্র সেন।

রবীন্দ্রচেতনায় গীতার রূপ—প্রবোধচন্দ্র সেন।

পুরাণ পরিচয়—ডঃ অশোক চট্টোপাধ্যায়।

প্রাচীন ভারতের দেব ভাবনা—মিতা চট্টোপাধ্যায়।

জীবনী কোষ—শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার।

ঋগবেদের দেবতা ও মানুষ—মৈত্রেয়ী দেবী।

জীবন স্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ।

শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ—শচীন্দ্রনাথ অধিকারী।